www.milansagar.com
THIS PAGE IS ONLY A SCREEN SHOT OF THE HTML PAGE WHOSE ADDRESS IS:
http://www.milansagar.com/kobi/nabendu_sen/aagey_cholo/alekhya_nabendusen.html
SO NONE OF THE LINKS ON THIS PAGE WILL WORK. THIS PAGE IS ONLY AN INTRODUCTION
BY DR. NABENDU SEN TO THE HAND WRITTEN MAGAZINE "AAGEY CHOLO" OF 1946.

আগে চলো

MILANSAGAR HOME মিলনসাগর
সম্পূর্ণ **-আগে চলো-** পত্রিকার PDF ডাউনলোড
ডঃ নবেন্দু সেনের ভূমিকা "আগে চলো"
এ বিষয়ে আপনার আলোচনার পাতা..
আগে চলো হাতে লেখা পত্রিকা, প্রথম পাতা
সূচি পত্রের পাতা
দ্বিতীয় পাতা
নজরুলের কবিতার পাতা
গুরুদেবের ছবি-সৌরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
কবিতা বিভাগের শুরুর পাতা
শেষের দান-অনিল রায়চৌধুরী
ভাবী কাল-শ্রী কালিদাস নবরত্ন শিরোমণি
কীট কাণ্ড-ক্ষেত্রনাথ রায়
সুভাষ জয়ন্তী-মন্মথনাথ ঘোষ
ওরে হিন্দু মুসলমান-জীবনাথ রায়চৌধুরী
অতল গভীর তীরে-নির্মল সেনগুপ্ত
প্রবন্ধ বিভাগের শুরুর পাতা
মাখনের দেশ-নেপালচন্দ্র রায়
বাঙ্গালী হিন্দুদের দাবী-বিহারীলাল চক্রবর্তী
আমি নদী-অশোকা রায়
শিশির রৌদ্র-দেবকুমার
মুলঘরবাসীর পরিচয়-মথুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত
গল্প বিভাগের শুরুর পাতা
স্বপ্ন না বাস্তব-শৈলেন সেন
বিবর্তন-কমলচন্দ্র রায়চৌধুরী
বন্ধু-রমা সেনগুপ্ত
দুর্ঘটনা-বীথি বসু
টুকরো সন্দেশ
আমাদের কথা ও **সম্পাদকীয়**

অবিভক্ত বাংলার, খুলনা জেলার, মূলঘর গ্রাম থেকে ১৯৪৬ সালে, কমলকুমার রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল হাতে লেখা পত্রিকা, শারদীয়া **আগে চলো**। দেশভাগ ও পরবর্তী দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বাঙালী জীবনের কঠিন পরিস্থিতি পার ক'রে, কালের গ্রাসের হাত থেকে বাঁচিয়ে, নিচে দেওয়া একটি ভূমিকা সমেত, পত্রিকাটিকে সম্প্রতি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ডঃ নবেন্দু সেন, বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

১৯৪৬ এর সেই হাতে-লেখা পত্রিকাটিকে আধুনিক প্রযুক্তির আভরণে পুনরায় প্রকাশিত করা হল মিলনসাগরের ১৪১৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় নিবেদন হিসেবে।

হাতে লেখা পত্রিকা "আগে চলো"-র প্রথম পাতায় যেতে নিচের ছবিতে অথবা এখানে ক্লিক্ করুন
অথবা বাঁ-পাশের সূচিতে গিয়ে আপনার পছন্দের পাতায় ক্লিক্ করুন

আগে চলো

এই পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা করুন এখানে ক্লিক্ করে . . .

ডঃ নবেন্দু সেন, নয়াদিল্লি, ৩রা অক্টোবর ২০১১, চলভাষ +৯১৯৮১১৩৮৬৫৫৭,
ইমেল : sensandy@hotmail.com

বর্তমান বাংলাদেশে, খুলনা জেলার, বাগেরহাট মহকুমার, মূলঘর গ্রামের যুবশক্তির সারস্বত চেতনার অন্যতম চিহ্নায়ক হাতে লেখা একটি পত্রিকা হল "আগে চল"। কে বা কারা এই পত্রিকার নামকরণ করেন তা আমার অজ্ঞাত। আমার নিতান্ত শৈশবেই এই সারস্বত চর্চার সূত্রপাত সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। নীলরতন সেন এবং শৈলেন সেনের বিরামবিহীন কর্মোদ্যমে "আগে চলো" ক্রমাগত এগিয়েই চলেছিল।

আমার মধ্যম অগ্রজ, আমার পিতৃতুল্য শ্রী নীলরতন সেনের মুখে এবং নিজের অস্পষ্ট স্মৃতিতে শোনা ও দেখার এই অতি আদৃত, অতি মূল্যবান সাহিত্য রুচির পত্রিকাখানির একটি মাত্র খণ্ড আমার নিকট অদ্যাবধি ছিল। অনুমান করি আমার মধ্যমাগ্রজের অকুণ্ঠ স্নেহ ভালবাসা ও আমার প্রতি তাঁর দ্বিধাহীন আস্থাই তার কারণ। ঠিক যেমনটি ছিল আমাদের পিতার অসাধারণ, অকপট সরল কাব্যচর্চার চিহ্নায়ক হাতে লেখা খাতাটি আমাকে অর্পণ করার ক্ষেত্রে। এ দুটি সারস্বত মেধার অমূল্য সম্পদ আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি।

কালের নির্মম প্রহার থেকে এ দুটি সম্পদ বাঁচিয়ে রাখার আশায় আমি আমার নিজের বড় ভাইঝি শিপ্রার স্বামী মিলন সেনগুপ্তকে তাঁর মহামূল্যবান ওয়েবসাইটে (www.milansagar.com) ধরে রাখার জন্য দিয়েছি। শর্ত এই দুটি অতি মহার্ঘ বস্তুই আমাকে তাঁর কাজ শেষ করে ফেরত দেবেন, যাতে আমার জীবৎকাল পর্যন্ত আমি এই দুটি সম্পদকেই আমার নিকট রাখতে পারি, এবং অপত্য স্নেহে রক্ষা করতে পারি।

"আগে চলো" পত্রিকার কোন মুদ্রিত সংস্করণ ছিল না। ছিল না প্রথিতযশা অতি বড় কোন সাহিত্যিক নেতার আশির্বাণী; ছিল না কোন আর্থিক সম্বল। গ্রাম বাংলার উদ্যমী কয়েকজন যুবক যুবতীর সাহিত্যচর্চার নিপাট উর্বর ক্ষেত্র মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যা তা কেবল কল্পনা বিলাসিত খেয়াল খুশির মনভোলানোর যন্ত্রণাও ছিল না। ছিল রীতিমত সমকালীন সমাজ, রাজনীতি এবং অবশ্যই নিজেদের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের অগ্রগতির পরিচিতি। শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম, রুচি ও আভিজাত্যের সঙ্গে মানমাত্রার স্তরে উন্নীত সাহিত্যবীক্ষার পরিচয়। ছিল উঁচু দরের উইট, জীবন পর্যবেক্ষণ এবং সমকালীন সমাজ চেতনার চর্চিত জিজ্ঞাসা ; যা যে কোন বড় পত্রিকার সামগ্রী হতে পারতো। নাম না-জানা নিতান্ত গ্রামীন অবস্থানে সে সময়ের কয়েকটি তরতাজা যুবক যুবতীর প্রাণভরা চেষ্টার ফসল এই "আগে চলো"।

আজ সে সময়েও নেই, সে সমাজও নেই, নেই সেই রুচি --- সবই পরিবর্তিত। তবু সেই অখ্যাত পত্রিকাটি যেন এক বৃহৎ সত্যেরই আহ্বান জানায় --- "আগে চলো"। "চরৈবেতি"।

কোন উৎসাহীর দৃষ্টি পড়লেও পড়তে পারে এই অনিরুদ্ধ এগিয়ে যাবার সারস্বত পথে। আমি বিশ্বাস করি "আগে চলো"ই এখনো আমার মনের এক সারস্বত পারমিতা।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

অধ্যাপক নবেন্দু সেন তাঁর স্মৃতি থেকে আমাদের দিয়েছেন "**আগে চলো**"-র লেখক, শিল্পী ও সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যদের পরিচিতি যা আমরা নিচে দিয়ে দিলাম। আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি যে যদি কেউ এই মানুষদের সম্বন্ধে আরও তথ্য আমাদের জানান তাহলে তাঁদের নাম সমেত, আমরা এই পাতায় তুলে দেব আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

পরিচিতি

১। সৌরেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী	মূলঘরের বড় বাড়ীর প্রথিতযশা শিল্পী।
২। অনিল কুমার রায়চৌধুরী	মূলঘরের বড় বাড়ীর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের অণ্ডাল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার হয়েছিলেন।
৩। কালিদাস, নবরত্ন শিরোমণি	!
৪। ক্ষেত্রনাথ রায়চৌধুরী	মূলঘরের পশ্চিমপাড়ার ছুনন রায়চৌধুরীর পুত্র।
৫। মন্মথনাথ ঘোষ	মূলঘরের ঘোষপাড়ার।
৬। জীবনাথ রায়চৌধুরী	ছুনন রায়চৌধুরীর পুত্র। চাকরিসূত্রে তিনি দিল্লি প্রবাসী ছিলেন। অভিনেতা। সাহিত্য চর্চায় সুনাম অর্জন করেন। রামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাত হয়েছিলেন।
৭। নির্মল সেনগুপ্ত	!
৮। নেপাল চন্দ্র রায়	বিখ্যাত ঐতিহাসিক। মূলঘরের অন্যতম কৃতি সন্তান। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ধন্য। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন।
৯। বিহারীলাল চক্রবর্তী	মূলঘর খড়োরিয়া হাই ইংলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।
১০। অশোকা রায়	শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর (পুন) কন্যা। উচ্চশিক্ষিতা।
১১। দেবকুমার	!
১২। মথুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	মূলঘরের নতুন সেনের বাড়ির। লোকচরিত্র সমালোচক। মথুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর পুত্র মণীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্থপতি রমেশচন্দ্র সেনের ৪র্থ কন্যা ইলা দেবীর।
১৩। শৈলেন সেন	মূলঘরের নতুন সেনের বাড়ির। নানা গুণের যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব। মূলঘরের কবি শচিন্দ্রনাথ সেনের মধ্যম পুত্র নীলরতন সেনের সঙ্গে একত্রে "আগে চলো" পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন।
১৪। কমলচন্দ্র রায়চৌধুরী	মূলঘরের পশ্চিমপাড়ার অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যানুরাগীও। "আগে চলো" হাতে-লেখা পত্রিকার সম্পাদক।
১৫। রমা সেনগুপ্ত	মূলঘরের কবি শচিন্দ্রনাথ সেনের কন্যা।
১৬। বীথি বসু	!
১৭। নীলরতন সেন	মূলঘরের কবি শচিন্দ্রনাথ সেনের মধ্যম পুত্র। পরবর্তীতে প্রখ্যাত ছান্দসিক ডঃ নীলরতন সেন। কমল রায়চৌধুরীর সঙ্গে একত্রে "আগে চলো" পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন।

* * * * * * * * * * * * * * *

পাতার উপরে ফেরত

আগে চলো

ষষ্ঠ বর্ষ · শারদীয়া

মূলঘর

খুলনা

সম্পাদক—শ্রী-কমলচন্দ্র রায়চৌধুরী

সম্পাদনায় —

কমল রায় চৌধুরী

পরিকল্পনায় —

নীলরতন সেন
শৈলেন সেন
সুভাষ চক্রবর্তী
তপেশ রায়
সুরজিৎ রায়
মিলন রায়

[illegible]লিপি ও শিল্পায়নে —

নীলরতন সেন
শৈলেন সেন
নির্মল সেন
অনুপম সেনগুপ্ত
মন সেনগুপ্ত

আজ,   রনরঙ্গিনী জগৎমাতার দেখ মহারন
দশদিকে তার দশ হাতে বাজে দশ প্রহরন!
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহবাহিনী জানায় আজিকে
বিশ্ববাসীকে —
শাশ্বত নহে দানবশক্তি, পায়ে পিষে —
যায় শির পশুর।

— নজরুল ইসলাম —

সূচী

চিত্র :-	শিল্পী।	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্রনাথ —	✓ সৌরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	১
কবিতা :—		
শেষের দান —	শ্রী অনিল কুমার রায় চৌধুরী।	৩
ভাবীকাল —	" কমলদাস, নবরত্ন শীলরমাল।	৫
তীর্থ ক্ষেত্র —	" সৌম্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	৭
সুভাষ জয়ন্তী —	" মন্মথনাথ ঘোষ।	৮
ওরে হিন্দু মুসলমান —	" জীবননাথ রায় চৌধুরী।	১১
অতল গভীর তীরে —	" বিমল সেনগুপ্ত।	১২
প্রবন্ধ :—		
মঙ্গলের দেশ —	✓ নেপাল চন্দ্র রায়।	১৫
বাঙালী হিন্দুদের দাবী —	শ্রী বিহারীলাল চক্রবর্তী।	১৭
আত্মকাহিনী :—		
আমি নদী —	" অশোকা রায়	২২
শিশির বিন্দু (রূপক) —	দেবকুমার।	২৫
মুসলীম বাংলার বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় —	" মথুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত	২৭
পরিপূরক —	পরিপূরক	২৮
গল্প :—		
স্বপ্ন না বাস্তব? —	" শৈলেন সেন	৩০
বিবর্তন —	" কমলচন্দ্র রায় চৌধুরী	৩৪
বন্ধু —	" রমা সেনগুপ্তা	৪৩
দুর্ঘটনা —	" বীরেশ বন্দ্য	৪৬
ছন্দে সন্দেশ —		
ইতিহাসের ছন্দ ও সম্পাদকীয় —		৫৩ ৫৪

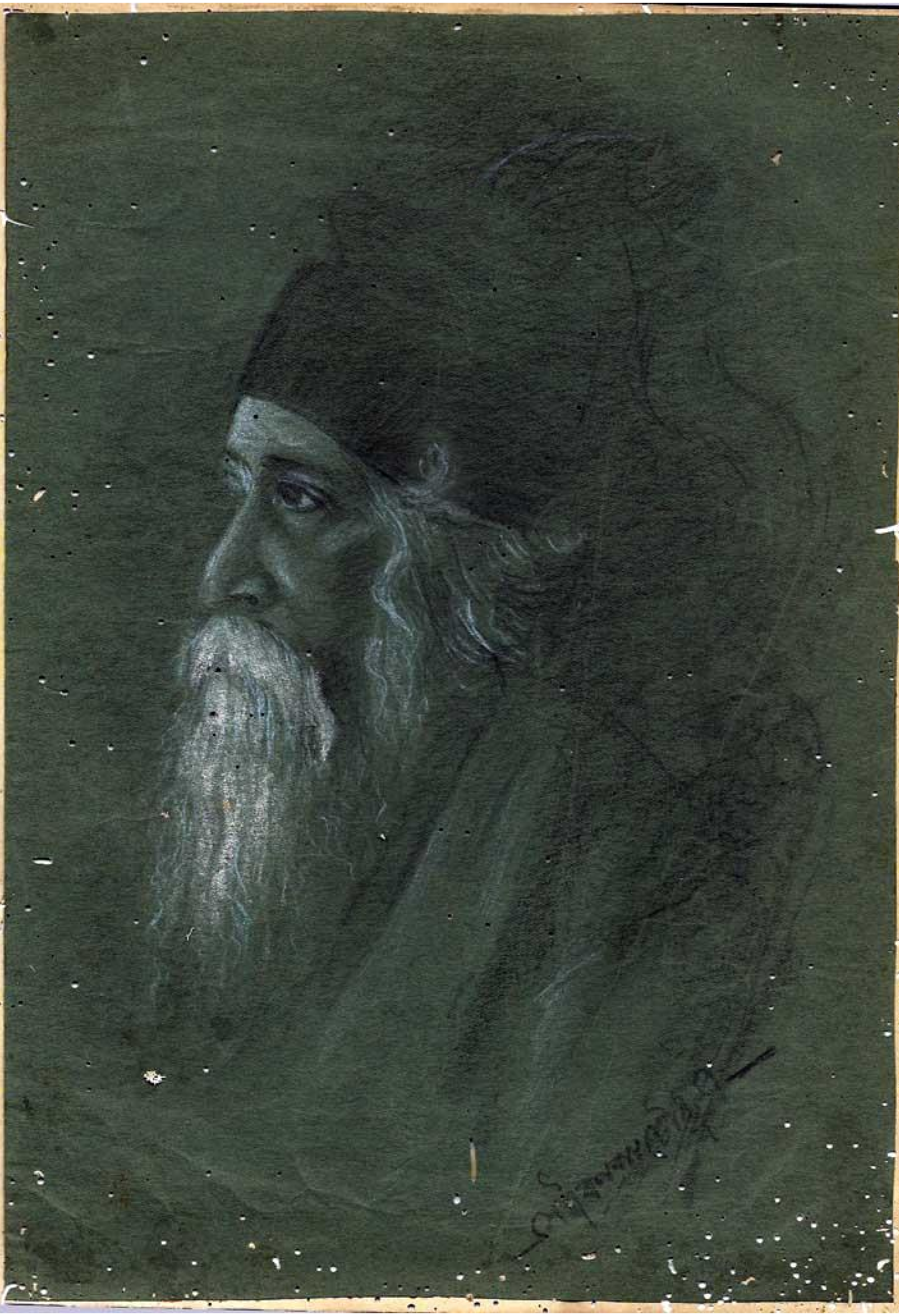

কবিতা

শোকের দায়।

(পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺ নেপালবাবুর মৃত্যু সংবাদ প্রসঙ্গতে)
অমিয় রায় চৌধুরী (বড়বাড়ি)।

দূরের প্রবাসে বিদেশী যখন শুধাল, "কোথায় গাঁ-?"
খুলিয়া বুকটা দুহাত ইহল গোপন করিব না।
"নেপালবাবুর নাম শুনেছতো? হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই তিনি।
বোলপুর নয়; মুলঘর তাঁর জননী জন্মভূমি"।
"চলে যান তিনি?" "এতো কথা শুনে, জানকী জনক কারে-!
তাঁরে চেনে গাঁর প্রতিধুলি কণা; বলিতে হবে কি আর-?
বড়ই দুখিনী জননী আমার; নেপাল যশোদা-গোপাল;
গোষ্ঠে যায় বটে রাখিতে পারেনা, সাঁঝে তার গোপনে ফেলে-।
দেবী বীণাপাণি মূর্ত তাহাতে [redacted] দয়া আছে গাঁর প্রতি-
লক্ষ্মী তাঁহার দয়া মায়া হীনা নির্দয় তিনি অতি-।
প্রায় ছেড়েনা আমরা তাহাতে, বিশ্বাস নাহি হয়;
নেপালে হারিয়া কি জেনেছি গ্রামে দেখ এসো মহাশয়-।
যতদিন আছে দুকলঙ্ক মোদের আছেন নেপাল সাথে,
যত নির্দয় হউন লক্ষ্মী ভাবিনাকো মোরা তাতে।
আত্মস্তুতি? লজ্জিত নহি, প্রার্থনা, ভগবান;
এইটুকু তুমি কেড়ে নিও নাগো; ইহাই পরমান।"

বিদায়ের কালে পা'খানা ঠেলিনু "মা মা ছেড়ে মোরে ফিরে-
আমার গাঁয়ের স্মৃতি তুলিলে ভুলে যাই সব শোক

শুনিলাম না তো তার কথা কিছু, কোথায় তোমার ঘর—
পরিচয় তার জানিতে বন্ধু শুনিতে ইচ্ছা বড়—।
পথিক কহিল, "কেহ যদি তার অতীতের কথা কহে,
বর্তমান? কাল কে সে দিয়েছে, অতীতের স্মৃতি সব—।
বন্ধু কহিল, "নবাব সিরাজ ছিলেন মোদের জাতি—
আজিকের কথা? কিছু নাই তাই ভাঙিয়া মরিছে লাথি—"।

ছয়মাস পরে উঠিব চরে— দেখিয়া গগনে চাহি
পশ্চিমে ঐ সূর্য্যের ভাতি জ্বলি উঠি রহি রহি—
"আছি" মরে যায়, রয়ে গেছে তার মাঝে "গত কাল"
যা "আছে" তাহাও "ছিল" হয়ে যায়— ধোঁয়াটে কুয়াশা জাল—।
খবর এসেছে যশোহর জিলায় দুয়ার দেয়— গেছে চলে
আর আসিবে না; পল্লী-নয়ন ভাসে যায় আঁখি জলে—।
দুঃখ আমাকে বেশী করে দেয় মোদের জননী তার—
রহিল না কেউ দেখিবার তরে, সকলে আঁধার ঘরে—।
শত বছর ভেসে গেছে হায়— ক্ষীণ আজি দেহ বল—
"হিতৈষী ভাণ্ডার", "পল্লী বিদ্যালয়" সবে দলে চল চল।
ভেসে গেছে বন্যা অন্যকাহিনী, সভ্যতা হীন সভা—
শান্তির তরে কত, দিনে গেছে শান্তি করে দিতে—
ক্ষীণ আশা আছে, পুত্র সন্তানে দেখ দেখ ঐ হেঁ—
ব্যাকুল হিন্দু যেন ধীরে ধীরে আজ ফুটিয়া উঠিছে না?
যাবার বেলায় আমাদের তরে সূর্য্যের এই দান—
জ্যোৎস্না রজনী আনিবে, আনিবে নবীন প্রাণ—।
পাঞ্চজন্য সাথে লয় নাই দিয়ে গেছে দয়া করে,
জীবের জননী বাহিরে ঘরে ফুঁ দেবে মোরা তারে—
ফুঁ দেব শক্তি দাও প্রভু দাও, শুনিবার তরে কান—
বধির যেন না বিফল না হয়— তাহার শেষের দান"

শ্রীঅনিলবরণ রায়চৌধুরী

ভাবীকাল

-শ্রীকালিদাস, নবরত্ন শিরোমণি।

আমি যদি জন্ম নিতেম রবিবাবুর কালে,
হয়ত জুটতো লেখার প্রাইজ আমার মন্দ ভালে।
সাবান তেলের স্তুতি গেয়ে, মাসিক কাছে নিতেম চেয়ে,
স্নোপাউডারের ঢাইস প্রাপ্ত আশাতীত মতন করি;
কাপের স্কুলে, চায়ের স্কুলে, জুটতো হয়ত সন্ধ্যাকালে,
লেকের ধারে প্রিয়ার তরে কাব্য নিতেম ছুঁড়ি;
রসিকতায় চাঁদও যেত প্রাগৈতিহাসিক চালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম রবিবাবুর কালে।

২

উঠেই নিতেম সাড়ে আটটায়, জুটতো হত ভিড়,
আসিতাম তোরই প্রিয়ার বাড়ি গড়ে যেতেম ভিড়।
কাপের ধুঁয়া বুকে করে, মিলন হত ক্লাবের ঘরে
সেকালেরই সাহিত্যেতে থাকত সেসব গাঁথা।
প্রেমালাপটাই দীর্ঘ হত, হাস্য লাস্য ছলের কত;
মিথ্যেরই মতন তত্ত্ব কইত প্রিয়া কথা।
আজও সাথের সেতের মতন পাহিরায় ভিড়,
পিতামহের এমন সময় ছাড়িতে হবে ভিড়।

৩

আলোময় বেয়ে গা' ঢাকিতাম এড়িয়ে পাড়াহাতে,
প্রিয়া হতো ক্লান্ত দিবার ক্লান্তি রংকুলাতে।
কম্পিটিশনের নম্বরগুলি সব, ক্লান্ত দিনে করিতো রব,
শরৎকালের জুড়িগাড়ির বন্ধনাদের মত।
"যেয়ে বেড়াই একা একা, অসংখ্যহীন তার নাইটিং দেখা,
ইতিহাসটি ক্লাবের ঘরে কি কথা তোর এত?"
লেকের তীরে গা' ঢাকিতাম সুবর্ণ সন্ধ্যেরাতে,
ভুলেও যেন নিতাম না গা' গলাদের ফুটপাথে।

হিমালয়ের তুল্য চূড়া যাঁর জ্ঞানের মাঝে,
সারাজীবনটাই বৃথা দিলেন প্রজাদের কাজে।
বনের মাঝারে, চাঁদের কোলে, যেমন রবির কিরণ জ্বলে,
মনে হয় নবে চাঁদের শুভ্র মেঘের আলো।
মাঝেমাঝে ঢেউয়ের দোলে, কাশবনের ফুলে দোলে;
তাঁদেরই আঙিনাতে মনে দিলেন জ্বালা।
তুমি হলেও দূর দেশের প্রজাদের মাঝে,
সকল দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে আমাদের প্রিয়দের সাজে।

৫

হায়রে করে আমারে তরে রবিবাবুর কাল,
বসে বসে গুনগুনি করে গায় তাহারি সকল।
ছোটবেলার কালবেলা, আজিকার কালকে করে শুরু,
করবে না কেউ একাল নিয়ে মিথ্যে কোলাহল।
আমারে আমার সাথী ভারি, বরং দেখি বলে নারী;
পারলে না যা কোন কালেই চতুরতার দল।
তাইতেই তুমি দিলাম একবার মালবিকার কাছে,
তেমন রাখি, কর সকল রবিবাবুর কাল।

ঠাঁই নেই

প্রেমেন্দ্রনাথ রায়,

প্রথমে এক উই-পোকা আশ্রয় পেলো
ডানা-ভাঙা-ডাক- নীচে পাড়ি দিয়ে গেলো।
স্থির হয়ে ঝিমুমন থাকে মুহ্যমান
তারপর- নড়ে-চড়ে, বুঝি ফেরে-প্রাণ।
পাড়ির পাড়ির তো- আশ্রয়ের পার
যদি- অনুভবে- চলে দেশ-দেশান্তর।
আশ্রয়ের গা বেয়ে- নেমে গেল ভিয়েনা
ফিরবে সেখান হতে যায় যে মিলেনা।
ঝিঁ-ঝিঁ পোকা গেল চলে, ভাবিল কি জানি
নিয়ে ঠেশহীন তার- দেহ-শুকনাখানি।
বেঁধা হতে বাসিন্দা, বাসিয়ে আশ্রয় হেরে-
খোঁজে খোঁজে সাথ-সাথ- যদি তুমি হেরে;
বাসিয়ায় এসে গেল, সেই লাগেলায়
যদি-না- দেখা দিয়ে, পুনঃ খেয়ে যায়,
খোঁয়াইয়ে- তা- ঘুরে-ফেরে; অদ্যাবধি-
ভাবিল যদি বুঝি- আছে আশ্রয়-পথ
উদ্বাস্তুর ছিদ্রপথ নেমে গেল আগারে-
এরপর ঠাঁইয়ের- খোঁজে, কি সাহসে আসে রে।
সর্বশেষ আশ্রয়েও ভাবিলনা যদি
আশ্রয় যে আছে, হায়, আছে যে আশ্রয়।

দুর্গতি হীন আসিয়া তো- বিশাল- অরণ্যে-
যদি মেলেনি তবু তার সমাচার।

এলাহাবাদ
২৩শে আষাঢ় '৫৩।

সুভাষ জয়ন্তী

সন্তোষ নাথ ঘোষ।

"তুমি হিন্দ, তুমি হিন্দ,"
আসমুদ্র 'ঐক্য' সিন্ধু,
তোমাকে নমস্কার —
'তুমি নেতাজীর'
নমো সুভাষে কোটি বার।

তুমিই ছিলে দুর্জয়বীর
কন্যার পথে পারে
জননীর কোলে ফেলে দূরে গিয়ে
২৩ দিন আন্দামানে

হিন্দু – মুসলমান –
শিখ আর খৃষ্টান –
দূরে গেল ভেদ,
বিদ্বেষ ক্লেদ,
মুছে গেল দুর্দিন।

সত্য সাধনায় সাধি ছিলে তবে
স্বদেশ-ভক্তির দাবে,
নতুন কালের বাণীর উদ্দীপন
সকলেই মুগ্ধ মানে।

এ নহে সুভাষ,
এ নহে কাহিনীর,
স্বাধীন ভারত
স্বাধীন কাহিনীর
মুক্তি সকলের হবে দুখালে
ভারতের মাঝে।

"দূর দিগন্ত, দূর দিগন্ত"
আকাশে তেপান্ত দিগন্ত
তুষারে মন্দির — 'দূর তেপান্তর',
নয়ে সম্মুখে কোথা ফিরে।

দুর্দিনে ধূপ দহনের আলো-
চন্দ্রমল্লিকার রং।
শুধু তারারে "যাক বিস্মরণে"
সাধনে, সাধনে, তেপান্তর সুন্দর;
দূর তেপান্তর দূর।
শুধু কাঁদিনে প্রতিক্ষণ সাথে
মৃত্যুর বিনিময়ে।

দেখে ঘরে; দেখে একাকী নীরবে,
বিশ্বের বিস্তীর্ণ!
ফিরে এসে আজ নবীন সুন্দর-
কবিতা করি দিন
আজি ভাবনার সকল সবারে,
যে আলো: দিলে তুমি,
শুধু সকল সার্থকতার ভরে
বিশ্বের আপনার চরণে।

কে বলে সর্বস্ব?
মরণের সুন্দর!
শুধু তোমার নাই।
বেদন বেদন করে বিদায়
ভুবনে
তোমারে যে সবার ঠাঁই।

ভারতের প্রতি ঘরের কোণেতে
সর্বত্রে প্রতিটি মনে
কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠ ধরে
ভারতের, মিলন [illegible]রের মনে।

'স্বাধীন ভারত'
'স্বাধীন কাশ্মীর'
এ নহে স্বপন
এ নহে কাহিনী
"জয় হিন্দ, জয় হিন্দ,
জয় কাশ্মীর",
জয় হিন্দ জয় কাশ্মীর।"

— o —

ওরে হিন্দু মুসলমান!

শ্রীজীবনাথ রায় চৌধুরী।

ওরে হিন্দু মুসলমান!
তোরা যে বিঁধিলি নিজের বুকে
নিজের ছুরিখান।
নিজের জন্য নিজেরে মারিলি,
নিজের দোষে নিজেরে হারালি,
বাঁচিবার তরে - কেন তবে চাস এত মান?
ওরে হিন্দু মুসলমান!

ওরে হিন্দু মুসলমান!
সেদিন ছিলি তোরা আল্লা হরির -
স্বাধীন সন্তান,
তোমার সেদিন আপনা হতে
মত আল্লা [redacted] আছে নিজের বুকে,
আপনা হতে মিলবে, অন্ন, পুরবে মনস্কাম.
ওরে হিন্দু মুসলমান!

অতল-গম্ভীর-তীরে

(অনুবাদ)

বিমল সেন গুপ্ত।

পৃথিবীর গন্ধ যবে ধূমল সাগর-মাঝে
ঝরে পড়ে
অনবরত সুরে;
ধূমায়িত নীলাকাশ-পানে —
রক্ত-আভায় সাগরজল —
প্রতি বিন্দুর স্রোতে,
তব মধুর-স্বপন-সুধা ঢেলে দেয়
মোর হৃদয়ের দ্বারে;
পৃথিবী-সুন্দর-মাঝে
এক হয়ে যাই ॥

যবে রক্ত-আকাশ-মাঠ-প্রান্তর
অন্তিমে তাকিয়ে রয়, —
প্রতিদিন হৃদয় মনের রক্ত
অশ্রু-ধারায় বয়;
সাগর, বিদ্রোহ, মরণ, সুন্দর মাঝে
অনন্ত তাদের মাঝে
মিলি এক হয়ে ॥

সুদূর অতীত হতে
স্মৃতিপুঞ্জের সুরে,
চন্দ্রকিরণের রেখায়,
অন্তিম সাগর পারে
বিদায় করে মোরে;
তীর-ভূমির পারে ছুটে ॥

আরও, আরও,— নিঃশব্দ নিঃসীম আরও
শীর্ণ বিবর্ণ হাত।
যে, আমার সুমুখে
ওইত, ওইত দেখ ওইযে
কোমল অরণ্যের তার,
তুমুল গর্জনে —
— নিঃশব্দ নিস্তব্ধতায়
আমাদের সাথে
আজিও ঘুমাবে সবাই ।।

— ০ —

প্রবন্ধ

মাখনের দেশ

✓ মনোতোষ চন্দ্র রায়

গ্রেট ব্রিটেনের নিকটেই পূর্বে আর একটি দেশ আছে— তাহার নাম ডেনমার্ক। এই দেশের অধিবাসীদের আমাদের দেশে বলিত দিনেমার। কলিকাতার কাছে দিনেমারদের ভাঙা কুঠি আজও দেখা যায়।

ছোট্ট সুন্দর দেশ এই ডেনমার্ক। ব্রিটেনের চাইতেও ছোট, ব্রিটেনের চাইতেও ঠাণ্ডা, ব্রিটেনের মতই গ্রীষ্ম নাই, ব্রিটেনের মতই তার মাঝে কিছু কিছু বর্ষা হয়। কিন্তু ব্রিটেন যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার দেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখানে সেরূপ নহে। এ-দেশ চাষীদের দেশ। গো-পালন ও শস্য উৎপাদন বিশেষই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। এই ব্যবসায় হইতেই দারিদ্র্য প্রায় নাই বলিলেও চলে। এ দেশের লোকেরা খুব ধনী নহে, কিন্তু দরিদ্রও নহে।

কৃষিক্ষেত ও গোশালায় দেশটি ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের মত চারিদিকে ঘর ও মধ্যখানে ছোট উঠান। ঘরগুলির দেওয়াল পাকা, ছাদ লাল টালির। দেখিতে অতি সুন্দর। একদিকে বাসঘর, অন্যদিকে গোয়াল-রান্নাঘর ইত্যাদি। ঘরের ছাদের চিমনির উপরে বাসা বাঁধে বক। বক ডেনদের বড় প্রিয় পাখি। এই পাখী না কি সৌভাগ্যের বাহন।

প্রত্যেক চাষীর বাড়ীর কাছে শাক-সব্জী ও ফলের বাগান; তারপর ক্ষেত। খুব ঠাণ্ডা, তাইত এখানে ধান বা গম জন্মে না। যব, রাই ও গরুর ঘাস জন্মায়। এই সকল ফসল বিক্রয় হয় না — সকলই গরুর খাদ্য। ক্ষেতে বেড়া থাকে না। গরু বাঁধিয়া খাওয়ায়। গ্রীষ্মকালে গরুগুলি ৩/৪ টা করিয়া একত্র বাঁধিয়া চরাইয়া লইয়া যায়। তার পিছনে খুঁটি পুঁতিয়া বাঁধিয়া দেয়। দিনের মধ্যে ৩/৪ বার করিয়া খুঁটি বদলাইয়া বাঁধিয়া দেয়। কখনও কখনও গরু খুঁটি লইয়া ছুটিয়া যায়। তখন কি মুস্কিল ছেলেদের! এত কষ্ট করিয়া গরু চরাইতে হয়।

চাষীরা গরুর কত যত্ন করে, তোমরা শুনিলে অবাক হইয়া যাইবে। প্রত্যেক গরুর পৃথক নাম আছে; নাম ধরিয়া ডাকিলে গরু বুঝিতে পারে। শীতকালে গরুর গায়ে

গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া লইয়া যায়। গরু আবার গরম কাপড় গায় দেয় শুনিয়া হয়ত তোমরা খুব বিস্মিত হইবে। কিন্তু ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে তাহারা গরুর কি যত্ন করে।

এখানে কৃষকেরা সমস্তদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। বুড়া-বুড়ি, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কোন-না কোন কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে। এমন কি বালক-বালিকারাও বাদ যায়না। অতি প্রত্যুষ হইতে ইহাদের কাজ আরম্ভ হয়। সকালবেলা উঠিয়া ঘরদোর সব ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করে। তারপর কাঠের জুতা পরিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দে চলিল গোয়ালে। কাঠের জুতা পায়ে শুনিয়া তোমরা হাসিতেছনা? কাঠের জুতার গুণ— জুতা ভিজেনা, পায়ে ঠান্ডা লাগিতে পারেনা। তারপর গোয়াল পরিষ্কার, দুধ দোয়া। গরু দোয়া হইলে তাহা ছাঁকিয়া পাত্রে পুরিয়া রাস্তার পার্শ্বে রাখিয়া দেয়। যথাসময়ে মোটর-লরী আসিয়া দুধ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়।

এখানে দুধ সংগ্রহ ও তাহা হইতে মাখন তুলিবার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। সমবায় প্রণালীতে তাহারা দুগ্ধ হইতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে। কৃষকদের উদ্যোগেই প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যহ সকালে কারখানার মোটর-লরী প্রত্যেক বাড়ী হইতে দুধ লইয়া যায়। তারপর সুন্দর যন্ত্রের সাহায্যে দুধ হইতে মাখন তোলা হয়। মাখন বিশুদ্ধ করিয়া দূর দূর দেশে চালান করা হয়। সেইজন্যই একটি প্রধান ব্যবসা। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে যে, এই দেশের মাখন বিলাত পর্যন্ত চালান হয়। মাখন তোলার পর দুধ ইহাদিগকে ফেরত দেওয়া হয়। ইহারা এই দুধ তাহাদের মুরগী, হাঁস প্রভৃতিকে খাওয়ায়। মুরগী ও হাঁস ইহাতে পুষ্ট ও মোটা হয় এবং বেশী ডিম দেয়।

কৃষকেরা হার করিয়া তাহাদের দুধের দাম এবং কারখানার লাভের অংশ পায়। অন্য কোনও লোক ঠকাইতে পারেনা। অথচ, দুধ বিক্রয় করিতে বা মাখন তুলিতে অযথা সময় ও পরিশ্রম নষ্ট হয়না। নিজেরা এই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে গেলে কত সময় নষ্ট হইত, কত দুধের অপচয় হইত।

শূকর-পালন, মুরগী ও ডিম বিক্রয় ইহাদের আর একটি লাভজনক ব্যবসা। ডেনমার্ক প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ ডিম বিক্রয় করে। আমাদের দেশের লোক মুরগী-হাঁস

পারে, কিন্তু কেহই খুব দেয় না। কিন্তু ডেনমার্কে এইসমস্ত গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মত খুব বড়। দুধ খাদ্যদ্রব্য, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি তাহার নাগরিকদের সব খাদ্যদ্রব্য। সে-সব ডেনমার্কে দুর্মূল্য না। কিনিয়া খাইতে হয়। কিন্তু ডেনমার্কে দিনে ইহাতে প্রতিটি উপর লাভই হয়। প্রত্যেক কৃষক মুরগী পালে। ডিম দেয় ও বেশী দামে বিক্রয় হয়। ডিম বিক্রয়ের ব্যবস্থাও ভারী সুন্দর। সকল কৃষক মিলিয়া এক কারখানা খুলিয়াছে। কারখানার গাড়ী আসিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী হইতে ডিম-সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। ডিমগুলির উপর ডিম পাড়ার তারিখ লেখা থাকে। ডিমগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ধুলা ~~[illegible]~~ দিয়া ময়লা নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য মুরগী-হাঁসের ঘর খুব পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয় যেন পরিষ্কার স্থানে ডিম পাড়ে। কারখানায় ডিমগুলি পরীক্ষা করা হয়। মন্দ ডিম দিলে জরিমানা দিতে হয়। এজন্য কেহই মন্দ ডিম দিয়া ঠকাইতে চেষ্টা করে না। সততাই এই সমবায় ব্যবসা কারবারের প্রাণ।

ছেলেরা বয়স হইলে স্কুলে যায়। দিনের মধ্যে তাহারা দুই বার খায়। প্রথমেই রুটি, মাখন ও ডিম। ছেলে মেয়েরা কিছু সঙ্গে খাবার খায়; তারা তাহাদের পাঠশালায় থাকিতে হয়। খাবার পরই তাহাদের বিছানার ক্রমে শোয়ানো যায়। আবার তাহাদের পোষাক পরিষ্কার করিতে হয়। বিকালে আবার দুধ খাবারের সময় হয়। তাহাদের খাইয়া আসিতে হয়।

শীত ও গরমের মধ্যে ছেলেমেয়েদের তাহাদের খেলার কথা ভুলিলে না। খেলাতে তাহাদের যথেষ্ট আনন্দ ও উৎসাহ আছে। ছেলেদের ফুটবল যথেষ্ট আছে। ফুটবল দিতে কি মজা, কি আনন্দ তাদের খেলা! ফুটবলে তাহাদের এক বিশেষ ঝোঁক আছে। এইদিন তাহারা সেই কাপড় পরিয়া নানা উৎসবে পয়সা সংগ্রহ করে। তাহাদের সমস্ত পয়সা হাসপাতালে যায়। কেহবা ফল বিক্রয় করে। আর কেহ বা মধু, সাজিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া পয়সা সংগ্রহ করে। ফুটবলে এ কথাটি নানা

কই তোমায় কাঁদিয়া আকুল হইলাম। সত্যই তাঁর সেই অন্তরের কান্নাটিকে শান্ত করিবার সান্ত্বনা দিয়া কাটাইয়া দেয়। সেই রাতে আর কাহারও ঘুম হইল না।

ঠাকুমারও এর পুত্রবধূর দানের ঘরে আনন্দের সীমা নাই। সকলের এ নূতন ভাবে উঠিল সাড়া জাগায়।

বাঙ্গালী হিন্দুদের দাবী

শ্রী বিহারীলাল চক্রবর্তী. এম.এ. বি.টি.

মুক্তি সংগ্রামে ভারত জয়ী হইতে চলিয়াছে। আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ করিবে; দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যানবাহন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরিচালনায় প্রদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিবে। বাংলা দেশও এই অধিকার বঞ্চিত হইবে না, বর্তমানে ভারতের মুসলমানগণ নিজেদের ভিন্নজাতি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং পৃথক নির্বাচনের ফলে আরও সমস্যা প্রতীয়মান হইতেছে। মুসলিম লীগ ও অধিকাংশ মুসলমানের মনোভাব যেরূপ বিকৃত হইয়াছে তাহাতে বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানে মিলিত হইয়া একটি জাতি গঠিত হওয়ার আশা সুদূর পরাহত, বাংলার মুসলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ; এইরূপ প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা চিরকালই বজায় থাকিবে, এবং যেহেতু তাহারা আইন সভায় প্রাধান্য করিতে হিন্দুদের সুযোগ হইবে না; ইহা একরূপ সুনিশ্চিত যে তাহারা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা কোনদিনই অনুভব করিবে না। আজ আবার বাংলার ভবিষ্যৎ গভর্মেন্টে হিন্দুদের কোন প্রভাবই থাকিবে না, তাই আজ বাঙালী হিন্দুদের সম্মুখে এক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। যে বাংলার পূর্বগামীগণ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর অবধি দেশের সেবায় অম্লানভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছেন, ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূলে যে বাংলার হিন্দুদের অসীম ত্যাগ রহিয়াছে, সেই বাংলার হিন্দুদের ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাঙালী হিন্দুদের আজ বিশেষ ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে তাহারা তাহাদের রাজনৈতিক সত্তা বিলুপ্ত

হইতে দিবেন কিনা। অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা উঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। কাজেই হিন্দুদের উন্নতির পথে এরূপ স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইবার কোন সম্ভাবনাই আর দেখা যাইতেছে না। বাংলা দেশের যে অংশে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বাংলা দেশের যে সব অঞ্চল অন্য প্রদেশের সহিত বর্তমানে যুক্ত আছে, এই সব অঞ্চল লইয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিতে হইবে। মিঃ জিন্না ও মোসলেম লীগ একান্তই ইসলামের স্বার্থে আপত্তি তুলিয়াছেন, কিন্তু নীতির দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাদের এই আপত্তি টিকিতে পারে না। বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান প্রধান অঞ্চল পৃথক ~~[illegible]~~ হইয়া গেলে পৃথক পৃথক অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানের কর্তৃত্ব স্থায়ী হইবে। তবে অঞ্চলের অধিবাসীরা শান্তিতে বসবাস করিবেন এবং বর্তমানে তবে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তিক্ততা দেখা দিয়াছে তাহাও দূর হইবে। অবশ্য বাংলাদেশের মুসলমানেরা যদি যুক্ত নির্বাচনে রাজী হন তাহা হইলে সংখ্যালঘু হইলেও কাহারও প্রত্যক্ষ অংশে শাসনতন্ত্র দুর্বল করিবার ইচ্ছা কোন হিন্দুরই নাই। কিন্তু যদি মুসলমানগণ নিজেদিগকে ~~[illegible]~~ পৃথক জাতি বলিয়া মনে করেন এবং পৃথক নির্বাচন প্রথা বজায় রাখিতে চাহেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুক্ত বাংলা দেশে থাকা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে বাংলাকে এরূপ দুই ভাগে ভাগ করিতে গেলে পাকিস্তানী নীতিকেই স্বীকার করিয়া লওয়া। কিন্তু হিন্দু-বাংলা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না এবং নিজেদের একটি সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহে না। কাজেই বাংলাকে ভাগ করিতে গেলে পাকিস্তানী নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় না, মাত্র বাংলার হিন্দুদের একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। বাংলা দেশের বর্তমান আইনসভায় হিন্দুদের কোন প্রভাবই নাই। ভবিষ্যতে পাকিস্তান গঠিত হইলে অধিকন্তু বাংলায় হিন্দুদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হইবে।

এরূপ অবস্থায় আসামের দল-গভর্নমেন্টে বাংলার হিন্দু প্রতিনিধিদের সহযোগে কোয়ালিশন করা উচিত হইতে পারে; মুসলমানগণ যুক্ত-নির্বাচন প্রথা স্বীকার করিলে, না হয় প্রেসিডেন্সী বিভাগ, বর্দ্ধমান বিভাগ, সিংভূম মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা লইয়া পৃথক পশ্চিম-বাংলা প্রদেশ গঠিত হউক; রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা লইয়া পৃথক পূর্ব বাংলা প্রদেশ গঠিত হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে মুসলমান বন্ধুরা এই প্রদেশকে 'পূর্ব পাকিস্থান' আখ্যা দিতে পারেন। তবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যানবাহন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিবে; প্রশ্ন উঠিতে পারে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে যদি বাংলার হিন্দুরা বাংলাদেশকে বিভক্ত করিতে চান তাহা হইলে যে সব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় কম ঐ সব প্রদেশের মুসলমানরাও পৃথক প্রদেশের দাবী করিতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহেতে হিন্দুরা যুক্ত-নির্বাচন প্রথা মানিয়া লইতে সর্বদাই রাজী আছেন এবং এই যুক্ত নির্বাচন-প্রথার সঙ্গে সঙ্গেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের আসন-সংরক্ষণের প্রথা স্বীকার করিতে পারেন। কাজেই তাঁহাদের অবস্থা ও বাংলার হিন্দুর অবস্থা এক নহে। অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা যেরূপ যুক্ত নির্বাচন প্রথায় রাজী আছেন, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সেইরূপ যুক্ত-নির্বাচন প্রথায় রাজী হইলে এ-প্রশ্ন উঠিবে না।

— —

অগ্রহায়ণ - ১৩৫৩।

~ অসীম নদী ~

অশোক বসু

"পাহাড়ের পরে   পাথরের ঘরে
আমাদের সুখে-দুখে।
বিদ্যুৎ যেথায়   ঝড় ব'য়ে যায়
বহিয়া বিহগ-নীড় ॥
মেঘের ফুলরাশি   ফুটে হাসি হাসি
আপনি ঝরিয়া যায়
ফুলভরা 'মাঠ'   গাছ 'ভরা পাতা'
ফুলবাস 'ভরা বায়' ॥"

আমার জন্মস্থান পর্বতে। যেখানে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই, যেখানে পশুপক্ষীর বাস নাই, যেখানে বৃক্ষ, তরুলতা কিছুই হয় না — কেবল হু-হু করে বাতাস আর বরফ, সেখানেই আমার জন্ম। আমি কিছুই বুঝি না। হঠাৎ একদিন সূর্যের তাপে বরফ গলাবার পর আপনা আপনি বাহির হইয়ে পড়িলাম, দেখে দেখি সেখানে আমার কেউ সাথী নাই, কেউ সঙ্গী নাই — আমি একা। তখন ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বয়ে চলি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আর সূর্য-চন্দ্রের অপরূপ সৃষ্টি দেখবার আকাঙ্ক্ষায়। কিছুদূর যেতে যেতে অকস্মাৎ আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে মহাসিন্ধুর দূরাগত আহ্বান —

"কে আসিবি কে আসিবি
তোরা কে আসিবি আয়;
পাথর-চূড়ার বুকে, ভিজিয়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি ফুলেরে ফুটায়ে তোরা,
মাঠের শস্য-শ্যামল উপর দিয়ে ছুটে চলে
আমার প্রাণের মাঝে
কে আসিবি আয় তোরা।"

মশারিখানার মধ্যে অন্ধকারে আমার ঘুম ভেঙে উঠল, অমনিই উঠলেম
নেমে, তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দেখলেম আকাশখানার উদ্দেশে। সেই দিকে
পুবদিকের দিকে দেখছিলুম শুক-তারা আমার এই উঠান উঠলেও দেখে
তাদের মধ্যে শুধু একটি তারা আমার সামনে এসে দাঁড়াল আমাকে বলিয়ে
দিতে, আমার মুখের আলোয় ভিজিয়ে দিতে, কিন্তু এখনও এক-কণার
আমার অসীম শক্তির সাধনায়, কি আর বলি আমার এই মনোভূমিকে
দিয়ে! সে যে বহির বিন্দু অতিক্রম করে সমুদ্র কাঁপতে কাঁপতে কাঁদিয়েছে
পড়েছিল সকলের উঠানের উপর, যেখানে নিশান তুলে দিয়ে একটি পাহাড়
আমার সাড়ে তিন কোটি দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আজকের এই সময়ের মুখে
দেখে শীত পড়েছে তার মুখটাকে শুষ্ক করে দেখাচ্ছিল শুধু উঠানের ওপরে
বিন্দুর মেঘ, সকলের উঠানের উপর এসে আমার সাড়ে মণিমুক্তা ছড়িয়ে
এল, অমনি সেইসব মুক্তার মালা গেঁথে কম-কম হয়ে এগিয়ে উঠলেম
আমার অন্তরালে, আমার চোখের সামনে, কখনওবা আমি মনের কোণে
মুক্তি দিয়ে ফেলিলেম, কখনও আবার মুক্তির একখানা রেখা দেখে ফিরে
গেলে দেখিয়ে অন্তরের প্রাণে পাঠালেম, কখনও বা মন-প্রাণ দেখে
দিয়ে তাকে 'সন্ধ্যার সকালের অভ্যর্থনাগুলো' দিলেম, কখনও বা অভ্যর্থনাগুলো
দেখে দিয়ে তাকে প্রণাম করে ফেলেছিলেম আমার বুকের গভীরে শুনতে
পেলেম। তারপর এগিয়ে উঠলেম অভিজ্ঞতার দিকে — দেখলেম
কাক ডাকে ভোর হয় করেছে, বাতাসে তার নীর-অপরূপতা ফুঁকে বেড়াচ্ছে
ফুলগাছের বনে; নবসূর্যের উদয় দেখলে মনে, দূরের দিকে দূরান্তরের অবকাশে
করে দেখলেম — কাননে ফুলের ঝরনা আর কাননে সবুজের সৌন্দর্য, কিন্তু
দিয়ে ছুটে এল কাকের আওয়াজ, তাতেও ওঠে আমার মতো বেরিয়ে
পড়েছে চোখের সামনে। এদের মধ্যে দিয়ে আমার শক্তি উদ্ভাসিত হল,
নব নব উৎসবে দিয়ে দেখলেম, অমনিই বিস্ময়ে ভরে উঠল আমার সকাল,
অপরূপ মহিমা দিয়ে আমার মুখখানাকে উদ্ভাসের মতো উদ্ভাসিত করতে।
প্রভাতের সোনালি আকাশে মণিমুক্তা দিয়ে সোনালি রঙের, ফুল ফুটে
উঠতে লাগল রবীন্দ্রের ঘর-বাড়ি আমার মন-মুকুরে এসে হীরকখণ্ডের
মতো। অভ্যন্তরে দুই বিন্দু দুঃখের অশ্রুবিন্দুর মতো অশ্রু ঝরিয়ে
দিল আমারই বুকের উপর। অমনিই রবীন্দ্রনাথের — ঠাকুর
হয়ে পড়ে, তবে এই কবি সূর্যের সন্ধ্যাসকালের বেলায় আকাশ-বাতাস-বসিয়ে
বেড়াতে আসে আমারই সাথে। তাই — 'আমারই মতো ক্লান্ত'
ফুল-ঝুমকো আছে আমার 'স্বপ্ন-পুরে' 'চাঁদের আলোয় ঢেকে'।

পূর্ণিমার রাতে শুভ্র জ্যোৎস্নায় স্নান করে এগিয়ে যাই বিজুর সমুদ্র-তটকে সামনে রেখে, কোথাথেকে হঠাৎ এক বিরাম ফুলবাগান ছুঁয়ে বিদ্যুৎ আমার সামনে — দুর্বিনয়ে উঠল দুলে আমার। এই নিমিষে যেন আনন্দ-নৃত্য-ছন্দে দুলছিল সারা ধরা, কিন্তু হায়! অন্ধকার সরে গিয়ে দেখি আমার সামনে, শুধু আকাশের কাছে আমার প্রশ্ন রইল না — "মরণে না পাইনু হায়!"।

কৃষ্ণচূড়ার শতশত রেণুকা আমার বুকের উপর দিয়ে চুম্বন-ও খেলা করে, আমার বুকের উপর দিয়ে গিয়ে যায় আমারই চোখের সমুখ দিয়ে। কিন্তু আমার ধরার ক্ষেপে শক্তি কই! কত মধু-রেণুকা বিজুর অবিরাম-সাধনে বেড়ে বেড়ে চলে উন্মুক্ত উল্লাসে। তেমনি নতুন আমার বেদনাময় অবুঝ বিরহে, ফুলের যখন মধু হারে তখন আমার ফুলের প্রাণ ছুঁই কেঁদে — মধুবনের বিদ্রূপ-কৌতুকে, কিন্তু আমি নাকি-সত্য করে অধিকারবিহীন মরুর। বেদনার শক্তি কই! অতীতের চুম্বনে পড়ে, বিজুর চুমার পর একটু উঠে দাঁড়াই — মনে হয় আমার দুই তীর স বিজুরি যাচ্ছে দূরে, বহুদূরে, মনে পড়ে পেলব ফুলের স্মৃতি, আবার বিজুর এগিয়ে যেতে-যেতে দেখলাম আকাশের নীল চুমে যাচ্ছে মলিন ফুলের বুকে। সবুজ-শ্যামল উচ্ছ্বাসে তখন আমারই বুক পুড়ে ঝরছে অনন্তের বিরহ আর্তিনাদে। কী উতল-পাগল, উদাস দুপুর সে কি! কিনিত হয়ে উঠল কানে আবার সেই চেনা সুর —

"কে আমারি কে আমারি
কেবা কে আমারি আছে।"

এতক্ষণে আমার অন্তরকুটিরে চোখ মেললাম — নিরালায় মহাসমুদ্রের নিকুঞ্জ হতচকিতে। এক নিমেষে দূর হল আমার ভয়, ত্রাস। মহাসিন্ধু তার নীল ফুলবাগান দিয়ে দুলে দুলে আমার সাথে খেলে, আবার বারে দিয়ে তার ফেনার আদর দিয়ে আমার পা ছুঁয়ে, মহাসিন্ধু আর্দ্র, ক্লান্ত হয়ে গেল ঢেউয়ের দোলায় ঘুমে মেতে। তারপর?
তারপর —

" কেয়ার সুবাসিত মর্ম দেহে,
আমার উঠল হৃদয় কেঁপে;
এখন কোথাও সুর নাচে,
সাগর নিয়ে মোর বুক পেতে;
আমি নিরালায় ছিন্ন ঝিনুক
হব তারই আদুর ঝিনুক।"

শিশির-রৌদ্র (কথিকা)

দেবকুমার

শিশির হাত জোড় করে কাতর সুরে বলে — রৌদ্র এখন তুমি মাঠে এসো না, আর একটু দেরী কর; আমার সৌন্দর্যটুক নষ্ট করে দিও না।

রৌদ্র হেসে বলে — তাইতো ...... কি করি! আমার যে দেরী করবার সময় নাই; রৌদ্র একটু থামে — হুঁম ... কি বল্লে? আমি মাঠে এসে তোমার সৌন্দর্য নষ্ট করে দিই? ভুল বলেছ বন্ধু. .... মাঠে তোমার সৌন্দর্য শুধু আমার জন্যই।

শিশির মুখ বেঁকিয়ে বলে —— ইস্, কী দরদী বন্ধুরে আমার! এখুনি আমাকে মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে সমস্ত দিন থাকবে মাঠে, ও-ই আমার বন্ধু; — শিশির কেঁদে ওঠে।

রৌদ্র হেসে বলে — ও কথা বলো না বন্ধু, মাঠে যদি তোমার কোন বন্ধু থাকে তবে সে আমি, আর কেউ নয়।

শিশির বলে — কি রকম!

রৌদ্র বলে — এই শোন বন্ধু.... অমাবস্যা না থাকলে পূর্ণিমার আদর থাকতো না, তুমি যখন রাত্রির অন্ধকারে মাঠে নেমে যাও তখন কি কেউ তোমার সৌন্দর্য দেখতে পায়? কিন্তু দেখ, যখন আমি প্রভাতে তোমার কাছে যাই তখন আমার অরুণ আলোতে তোমাকে ঠিক মুক্তার মত দেখায়। তোমার সেই সৌন্দর্য দেখে কবির মন উঠে দুলে, শিশুরা তবে তুমি আমায়, পাখীরা ওঠে গান গেয়ে, তারপর সবাই যাত্রা শুরু করে তোমার দিকে থাকে চেয়ে, মধ্যাহ্নে প্রভাতে আমার অরুণ আলো তোমার মাথায় পড়লে মনে হয় যেন হাজার হাজার মুক্তা কেউ কিশোরীর ঘাসের উপরে সাজিয়ে রেখেছে। আমারই যদি আমার শক্তি প্রখর হতো তখন তুমি যেতে একদম অদৃশ্য হয়ে।

শিশির বলে — তবে যে বন্ধু আমার কথা ভুল।

রৌদ্র বলে — তাই-তো বলি, আমার তেজে অদৃশ্য হলেও তুমি আমার কোলেই আশ্রয় নাও, আমিও তোমাকে আদর করে আশ্রয় দিই। আবার যখন আমি মাঠ থেকে বিদায় নিই তখন

আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসিস তোমারে বন্ধু, কেমন — সত্যি কি না?
ওরে বেশ ভালোয় তোমার ফিরবে বন্ধু,
কিশোরের মুখে — তাইতো ঠিক তোমার হারাচ্ছি বন্ধু।
বৌদি আবদারটা বলে — না বন্ধু, আর নয়, ঢের হয়েছে খেলা। তোদের
সাঁঝের সাথে বন্ধু তোর হাত পেতেছি, তুমিও এমন আমার খেলা — সারাদিন
হাত পেতে আমার হাত, এমন .... বন্ধু .... এমন আর হবে না।
কিশোরের মুখে — সেই বন্ধু।

— ০ —

মুলঘর বাসীর - বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের

পরিচয়।

শ্রীমথুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত।

বঙ্গদেশের মধ্যে মুলঘর একটি শ্রেষ্ঠ গ্রাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ সরকারী ও বেসরকারী কাগজপত্রে ইহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। মুলঘর গ্রামবাসীর চিন্তাধারা, সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি ও ঐক্যের উপর ইহার উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছে। গ্রামবাসীর অধিকাংশই বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত। আমি গ্রামের কিয়দংশের অধিবাসীদের মধ্যে যে কোন গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি। অসদ্‌গুণ না থাকিলে সদ্‌গুণের উৎকর্ষতা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং কিছু অসদ্‌গুণের উল্লেখ করিতেও বাধ্য হইলাম। ইহাতে যদি কেহ অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হন আমি তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি — নারায়ণ চন্দ্র সেন। এম.এস.সি. ডি.এস.সি।

অলঙ্কার শাস্ত্রে — ভবপ্রসন্ন তর্কতীর্থ।

চিকিৎসা শাস্ত্রে — { কবিরাজ দক্ষিণারঞ্জন রায় চৌধুরী। এল.এম.এস।
ডাক্তার সুশীলানন্দ সেন, এম.বি। অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন।

দীর্ঘসূত্রতায় — সুধীর রঞ্জন রায় চৌধুরী, বি.এল। ইতিহাসে ও ভূগোলে ইঁহার জ্ঞান অসাধারণ।

দুষ্টতায় — ডাক্তার ভূপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী। এল., এম., এফ.।

[illegible] প্রিয়তায় — চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী। বি.এ.। বিদ্যাচর্চা ও জনহিতকর কার্যে ইঁহার উৎসাহ অসীম।

বাক্ সংযমে ও জনপ্রিয়তায় — শ্রীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী। এম.এ, বি.এল। ওকালতিতে ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

হিসাব নিকাশে — উপেন্দ্র নাথ সেন। বি.এস.সি। প্রাচীন ইতিহাসে ইঁহার জ্ঞান যথেষ্ট। জনহিতকর কার্যে ইঁহার ধৈর্য্যশক্তি অসাধারণ।

আত্মনির্ভরতায় — শরৎ চন্দ্র সেন (tall)
সত্যতায় — বিজয় কুমার সেন, বি.এ।
বীরত্বতায় — প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী। বি.এল্।
মিষ্ট ব্যবহারে — ললিত কুমার সেন। বি.এ।
দুর্দ্দিনেতে — জ্ঞানদা প্রসন্ন সেন। বি.এ।
গুরু গম্ভীর ধ্বনিতে — নিশিকান্ত রায় চৌধুরী (মনা)।
রঙ্গে সহিষ্ণুতায় ও রুচিতায় — সতীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (রামন)।
অকাল পক্কতায় — শিশির চন্দ্র সেন। (বঙ্কু)

পরিপূরক।

"আলোচনী"র সম্পাদক মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত মথুরেশ সেনগুপ্ত লিখিত "পরিচয়" শীর্ষক নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি দেখিলাম। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয় মুলঘর বাসীর চরিত্রের বিভিন্ন দিক দেখাইয়াছেন কিন্তু একটি বিশিষ্ট ~~বিষয়~~ বিষয়ে মুলঘর বাসীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করেন নাই দেখিয়া "আলোচনী" সম্পাদকের অনুমতি লইয়া সেই অনুল্লেখিত বিষয়টি এই স্থানে সন্নিবেশ করিতেছি।

পরনিন্দা-পরচর্চায় — মথুরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত।

পরিপূরক।

গম

স্বপ্নলব্ধ? — শৈলেশ

বিছানায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলাম। চিন্তনীয় বিষয় মামুলী। স্ত্রী-জীবনের সেই চরম ও পরম লোভনীয় বস্তু— দাম্পত্য প্রেমপ্রীতি। কিন্তু চিন্তা করিয়া কোন কূল-কিনারা পাইতেছিলাম না, মনে মনে সেই একই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাড়িত হয়, কেন স্বামী-মিলন ব্যর্থ হইল? যে-স্বামী-মিলনের প্রস্তাব পেশ করিয়া একদা সাদরে চিত্তে মহাত্মাজী বলিলেন, হুঁ, একদিনে হিন্দুরাজ এমন একটা কিছু ঘটিয়াছে যাহার জন্য তোমরা সকলে অনুভব করিতে পার:— সেই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি হইল না সেই প্রস্তাবেই মত দাঁড়াইলেন। ইহার চেয়ে অধিক প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রীতি চেয়ে, আর কি হইতে পারে? চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, ঠিক নাই।

* * * *

* * * *

নব-দিল্লীর রাস্তা। ওয়াং সদ্যবিবাহিত ঘরে প্রবেশ করিলেন। সহধর্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "Darling, এত প্রেম, এত চেষ্টা সব যে ভেস্তে যেতে বসেছে। দু'টোই সম্প্রীতি নিয়ে যে-রকম টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করেছে, তাতে সম্প্রীতি তো আর টেকে না। কী করে মেলাবো——"

"কি ভাবছো my sweet?" বলিয়া বেগম সাহেবা হাসিয়া উঠিয়া বসিলেন।

"ভাবছি যে, দেখ এতদিন তোমরা নাবালক ছিলে; তাই তোমাদের সম্প্রীতির দেখা-শোনা আমাকেই করতে হয়েছে। তা তোমরা এখন উপযুক্ত হয়েছ, তোমাদের দায়িত্ব তোমরা নেবে কি? তবে হ্যাঁ, মারামারি কাটাকাটি না করে নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ করে নাও।"

"Bravo! A good idea indeed!"

"Good idea কি একবার, একশোবার। সত্যিই এরকম আইডিয়া ওদের-খাঁটির মাথায় লোক কেমন পেয়েছে? তা হলে হবে কি? দু'দিনেই সেই দুধ-এবার দু-এবার তেল দিয়ে তাদেরকে পাকিয়ে তুলেছে। আমি বলি কি, একবার তুমি চেষ্টা করে দেখ। আমি তো নাজেহাল হয়ে গেছি।"

"আমি! What can I do for you?"

"আমায় এক কাজ করলে হয় না? ওই মেয়েকে একটা পার্টি দিলে কেমন হয়?"

"পার্টি দিলে তো হয়; কিন্তু কি দিয়ে পার্টি দেব? আর তা ছাড়া শুনেছি ও ঠাকুরদের খোরাক সাত্ত্বিক নিরামিষ। আমাদের হাতের রান্না খাবেন তো?"

"তা খাবেন বৈ কি? সেদিকে ভয় আমাদের ওর ছেলের।"

"তা হলে সমস্যা একটা মিটলো। কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যা দাঁড়াচ্ছে দৈনিক তিন দু'বেলার বেশী খাবার — এরকম কি একটা কথা শুনছি। সেটা কি সত্যি?" — মিস্টার বলে সৌম্য ঝুমার দিকে চাইলেন।

"ওটাই আমার কাছে এসেছে; কিন্তু verify করবার সময় পাইনি। ওর এক কাজ করলে হয় — ছেলেদের দুটো দিয়ে কিছু Indian-খাবার খাইয়ে দেখা। যেমন আমাদের যে-রকম গোঁড়া Indian, তা-তে মনে হচ্ছে এ উপায়েই বোঝা মেরে দেওয়া যাবে।"

"By Jove!" উল্লাসে সৌম্য একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। "Thank you for your kindness." কৃতজ্ঞতায় সৌম্য দুহাতে তাদের জড়িয়ে ধরলেন। "একটা প্রশ্নের তো solution হল। কিন্তু ও ঠাকুরদের নিয়ে কি করা যায়? ওঁরা তো আর ছেলেদের মত সন্তুষ্ট হবে না।"

"ও:! সেই উনাদের কথা বলছ? হ্যাঁ তাকে একটু অভ্যর্থনা নাড়া-চাড়া করতে হবে বৈকি? দেখ আমাদের একটু একটু কেমন-কুমু — পরিচয়ের জোগাড়ের পরামর্শ, কাজেই তাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যাতে হয়ে উঠবে। একটু পরিচয়ের জুড়ানো শুধু তাকে দিয়ে দিলে হয় না?"

"পরিচ্ছদের স্বাদ! what's that? কিছু বুঝতে পারছিনা। What do you mean to say darling?" — বৌদির দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা।

"এই ধরো যেমন রস-স্বাদ প্রভৃতি।"

"প্রত্যেকটা যেহেতু সত্য নয়, তা আমিই বলবো তো?"

"উচিত কি? দেখ, যদি কিছু করতে পার?" — বলিয়া পরম আরামে তাহা উপভোগে মনোনিবেশ করিলেন।

তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। যথাসময়ে জুটাকুংলো এবং নটাকুংলোর জুতার শ্রীহীন বিবর্ণ হইল। সামঞ্জস্য রীতি অনুযায়ী জুটাকুরলোরই আগে ডাক পড়িল।

জুটাকুংলো খাইতেছেন। হাঁটুর উপরে কাপড় উঠাইয়া খালি গায়ে দিব্য আরামে স্বদেশী ভাবে খাইয়া চলিয়াছেন। পাশে বৌদি দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিতেছেন।

"আর একটু দিই ঠাকুরপো?" বলিয়া হাতা কিছু ভাত উঠাইয়া থালায় দিতে গেলেন।

"না, না, কি করছেন কি বৌদি? মারা পড়বো যে!" বলিয়া ফিরাইয়া এক চিৎকার ছাড়িলেন।

"উঃ বুঝেছি। ঠাকুরপোর দু'পয়সার খাওয়া বুঝি শেষ হয়েছে।"

"ছিঃ! ওকথা বলে আর লজ্জা দেবেননা। সত্যি পেটে আর তিলমাত্র স্থান নেই। অনেকদিন পরে আজ একটা খাবার মত খেলাম। তা যাই বলুন না কেন, এতদিনে পাতে এমন একটা কিছু দিয়েছেন, যা নিয়ে গর্ব করতে পারেন।" — বলিতে বলিতে জুটাকুংলো উঠিয়া পড়িলেন। চাদর দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন, এমন সময় নটাকুংলো আসিয়া উপস্থিত।

"Hallo, দাদাবে! কি ব্যাপার?" পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাইতেছেন-কষ্ট স্পষ্ট।

"না বিশেষ কিছু নয়। এই এমনি একটু—" বলিতে বলিতে চাদরে মুখ মুছিতে লাগিলেন। মুখ দেখেও তাঁহার উচিত লাগিল আরও। সেই ভাইয়ের মুখ দুষিতে ভাল এড়াইলনা। অবশেষে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "Oh I see." তারপর বৌদির দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "তারপর বৌদি, what's the matter? Such an urgent call from you?"

"Oh nothing so urgent, only to enjoy your presence. তা' ভদ্রলোকদের আপনি বড্ড বেশি খাটিয়েছেন একটু বিশ্রাম করুন, এ' ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।"

"হুঁ হুঁ বুঝেছি" বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বাগানের দিকে পা বাড়াইলেন। এক জোড়া আরও ঘাটিং আসিয়াছে বেহুরো। না, তৌধির তাতেই বেশি লোকসান। কিন্তু ভেতরে উঠিতেছে তো ঐক্য জাগিয়াছে। ব্যাপার কি? না: একটু খোঁচা না দিলে হয়না। চিন্তা করিতে করিতে একটি কল্পনা লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আপাদ-মস্তক রি রি করিয়া উঠিল। 'কি? লোক-টাকে না জানালে এই ছিল? এযে দেখি দু'মুখো সাপ! ভেতরে ভেতরে তৌধির সঙ্গে নাচিতেছে! একেবারে বেহায়া! আর আমাকে এক হাত খাটিয়ে দিয়েই যাবে!' — বলিয়া মস্তক দোলাইতে দোলাইতে যে-পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া চলিয়া গেলেন।

আর ও' ভদ্রলোক ঘরে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছেন: তৌধির পেটে এত ছিল? দাদাকে কিন্তু হাতে খাটিয়ে গাধিয়ে যাচ্ছিল আর, আমাকে একটু নাচিয়ে দিয়েই যাচ্ছিল! কোনমতে টের পেয়েছিলাম: তা' না হলে — মাৎস্যন্যায় কী ভোলবার না। এ-সব জুয়ার করিয়াছি।

* * * *

* * * *

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখি ছোট কাকিমা খবরের কাগজ হাতে লইয়া ডাকিতেছে: "বড় কাকু!"

কাগজের নাম শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। তবে তখনও ঘুমের আবেশ, ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিনা, জোর করিয়া দু'চোখ রগড়াইয়া জোর করিয়া পড়িলাম:

Mission failed.

Leaders fail to reach an agreement.

অবাক হইয়া ভাবিলাম এ কী দেখিতেছি? এ কী স্বপ্ন না সত্য!

১০ই আষাঢ় }
১৩৫২ }

— —

বিবর্ত

—শ্রীকমলচন্দ্র [illegible]

বাড়ী ছিল তাঁদের মধুমতীর পাড়ে যশোহরের কোন এক ক্ষুদ্র গাঁয়ে। তাঁদের ঊর্দ্ধতন কোন এক পুরুষ গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপ থেকে ন্যায় শাস্ত্রে পারদর্শী হ'য়ে গ্রামে ফিরে এসে এক টোল খুলে ব'সলেন। গঙ্গাধরের পাণ্ডিত্যের কথা প্রবাদের মত শীঘ্রই দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড়ল। অনেক শিষ্যও জুটে গেল তাঁ'র।

যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য তখন মোগলের অধীনতাপাশ থেকে তাঁ'র প্রিয় বাঙ্গলা দেশকে মুক্ত ক'রবার চেষ্টায় ছিলেন। একদিন গঙ্গাধরের পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তিনি তাঁকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ ক'রে আনলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে বিদ্যোৎসাহী প্রতাপ মধুমতীর পাড়ে একটি ছোট জমিদারী ছেড়ে দিয়ে তাঁকে বাংলার নিভৃত পল্লীতে স্বাধীনভাবে জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তখনকার দিনে রাজধর্ম ছিল এমনই। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিদ্বানের সমাদর করা হ'ত, তাই দেখা যেত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা মুসলমান মৌলভী এখানে ওখানে টোল মাদ্রাসা খুলে জ্ঞান পরিবেশন ও জ্ঞানালোচনা করবার সুযোগ পেতেন।

গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় বংশানুক্রমে সেই জমিটুকু ভোগ ক'রতে থাকেন। দেশেও তখন কিছুরই অভাব ছিল না। যদিও মোগলের অধীনতাপাশ থেকে বাঙ্গলাকে মুক্ত ক'রবার জন্য বারভূঞা হিন্দুমুসলমান নৃপতিবৃন্দ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে নানারকম লাঞ্ছনা ও কষ্ট সহ্য ক'রছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর অন্নদিক দিয়ে কোনো অভাবই তখন ছিল না। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরুই ছিল বাংলার প্রকৃত স্বরূপ। যবন-শাসনের অধীনতার লৌহনিগড় তখনও বাঙ্গালীকে বাঁধতে পারে নি।

বিদ্বেষের অভিশাপ তখনও নেমে আসেনি বাংলার বুকে। বাঙ্গালী তখন পরস্পর পরস্পরকে ভাই ব'লেই জানতো। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ তখনও বাঙ্গালীর অন্তরে প্রবেশ করে নি।

* * * * * *

অবশেষে সেই সুখের দিন অবসান হ'ল।— দুঃখের তমিস্রাময়ী সন্ধ্যা নেমে এল বাংলার বুকে। বিদেশী দস্যুদল সোনার বাংলার ধন লুঠ ক'রতে এলো বণিকের ছদ্মবেশে। বাঙ্গালী নবাব সিরাজ কিন্তু ধ'রে ফেলেছেন তাদের চাতুরী। যুদ্ধ হ'লো তাদের সঙ্গে — হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বুকের রক্তে ভাসিয়ে দিলে পলাশী প্রান্তর। কিন্তু পারলে না তারা তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা ক'রতে। বাংলারই ছেলে তারা — তারা সেদিন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তুলে দিলে বাংলাকে বিদেশীর হাতে।

* * * * * *

কোম্পানীর রাজত্ব চ'লছে তখন দেশে।— ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর মহামারীর ধাক্কা বাঙ্গালী কোনও রকমে সামলে নিয়েছে। বিদেশী ভাষা শিক্ষা ক'রে, বিদেশী পোষাক প'রে বাঙ্গালী চেষ্টা ক'রছে বিদেশী হ'তে।—

গঙ্গাধরের ছেলের হরিদাস মুখুজ্যে ইংরাজী শিখে জেলা কালেক্টরের খাজনা আদায় বিভাগে মোটা টাকার চাকরী নিয়েছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধর হরিদাস মুসলমানি আর পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতার কৃষ্টিমত।...... তাঁর বসবার ঘরের দেয়ালে রঙীন পারসীক-সূক্ষ্ম কাজ ও কাঁচের ঝাড় ঘরের শোভা বৃদ্ধি করে। কিন্তু

বিষয়ী ও বুদ্ধিমান লোক তিনি। কালেক্টর সাহেবকে হাত করে জমিদারীটা বেশ বাড়িয়ে নিয়েছেন এবং সাথেই। —সেই সঙ্গে বিলাসের মাত্রাও বেড়ে চলেছে খুব করে।

*   *   *   *   *   *

একশ বছর পরে।—

হরিদাসের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মিঃ সুবিমল মুখার্জ্জী এখন জমিদারীর মালিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি.এ ডিগ্রী নিয়েছেন। বেশীভাগ সময় তিনি কলকাতার বাড়ীতেই থাকেন। জমিদারী দেখা-শুনার ভার দুই নায়েবের উপর। জমিদারের আগ্রহের অভাবে আর দুই নায়েবের অমনোযোগীতার ফলে জমিদারীর আয় ক্রমশঃ কমতে থাকে। বিলাস আর মদের খোরাক যোগাতে জমিদারীর আসলে টান পড়তে থাকে।—

*   *   *   *   *   *

সুবিমল মুখার্জ্জীর কিছুদিন হল মৃত্যু হয়েছে।— তাঁর ছেলে সুরেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। পিতার মৃত্যুর পর সে দেখলে পিতা তার জন্যে কয়েক হাজার টাকার দেনা রেখে গেছেন। সেই দেনা শোধ করতে সুরেশকে কলকাতার বাড়ীটি আর জমিদারীর প্রায় সমস্তটাই বিক্রী করে দিতে হল। থাকার মধ্যে রইল শুধু বসতপুকুরের বাড়ীটি আর তার সঙ্গে কয়েক কাঠা জমি আর কিছু ধানের জমি।

সুরেশ এখন গ্রামেরই হাই স্কুলে মাস্টারী করে আর টিউশানি করে কোনমতে সংসার চালায়। সংসার বলতে— সে, তার স্ত্রী, একটি মেয়ে, আর কোলের ছেলেটি। দুর্ভাগ্য তাদের ঘরে এখন যেন

বাঁধা র'য়েছে। সেবারের (১৯৩৮ সালের) বাঁধ ভেঙ্গে গেল মধুমতীর — তীব্র বন্যায়। সুরেশদের গ্রামও জলমগ্ন হ'ল। ধানের ক্ষেত ভেসে যাওয়ায় আর অনেক গরুবাছুর জলে ডুবে মারা যাওয়ায় সুরেশদেরও অনেক বাঙ্গালী পরিবারের মত অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল।—

তারপরই এলো করাল মূর্ত্তি নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ।—
জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য। সুরেশদের সংসার এমনিতে আঘাতে প্রায় ভেঙ্গে প'ড়েছে। স্কুল মাষ্টারীর সামান্য টাকায় আর চলে না। এক একবার ভাবে যে মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে শহরে গিয়ে মিলিটারীতে আর দশজনের মত মোটা মাইনের চাকরী নেয়।
কিন্তু ঘরমুখো বাঙ্গালীর মন।—
পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে যেতেও সুরেশের মন চায় না। বাড়ীর সবাই প্রায় ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছে। মেয়েটির পেটজোড়া পিলে। একটু দুধের অভাবে কোলের ছেলেটি দিনে দিনে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে।

এল পঞ্চাশের মন্বন্তর।— ......

একদিন সুরেশ ভিটেমাটি আঁকড়ে কোনমতে প্রাণে ব'চেছিল। কিন্তু আর সে পারলে না। এক মাসের মাইনে দিয়েও এক মণ চাল যোগাড় করা দুঃসাধ্য। শহরে শহরে মুনাফাখোরদের দল চোরাকারবারী ক'রে ফেঁপে উঠেছে। ওদেরই এককণা উচ্ছিষ্টের আশায় হা-ভাতের দল দলে দলে আসছে লঙ্গর খানার দিকে। আস্তাকুঁড়ে কুকুরের সাথে আহার্য্য নিয়ে মারামারি ক'রছে ক্ষুধার্ত মানুষ।

একবিন্দু ওষুধের অভাবে সুরেশের মেয়েটি মারা গেল।

অন্নের সন্ধানে সুরেশ স্ত্রী পুত্র নিয়ে ছুটে চ'ল্‌ল শহরের দিকে — বাড়ী-ঘর সব ছেড়ে। সহরে এসে মন্বন্তরে-দুঃস্থ পথিক মানুষ দেখে সে আঁতকে উঠ্‌লো। একদিকে মানুষ অতিলাভের আশায় মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অট্টহাস্য ক'রছে — অপর দিকে বুভুক্ষু সন্তানের মুখে অন্ন দিতে না পেরে পিতামাতা নীরবে অশ্রুবিসর্জন ক'রছে।

যাক — চাকরী পাওয়া খুব বেশী কষ্টসাধ্য নয় যুদ্ধের বাজারে। হয় মিলিটারী, এ.আর.পি অথবা সাপ্লাইতে চাকরী নেও — না হয় না খেয়ে মর। শিক্ষিত, সুদর্শন যুবক সুরেশ সাপ্লাইতে মোটর মাইনের একটি চাকরী পেয়ে গেল। শহরে এসে আবার অর্থের মুখ দেখে ভুলে গেল সেই দুঃখের দিন-গুলির কথা। চোরাকারবার ক'রে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে বেশ মোটা টাকাই জমিয়েছে। ক'লকাতায় একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে সে আছে। নাবালক ছেলেটি স্কুলে যায়। মোটের উপর বেশ ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল সুরেশের দিন গুলি।

সুখ-দুঃখ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। — যুদ্ধ থেমে গেল। এ.আর.পি, সাপ্লাই প্রভৃতি নূতন বিভাগ বন্ধ হ'য়ে গেল। সুরেশও হারাল সাধের চাকরীটি। তার সমস্ত সুখ শিশির-বিন্দুর মত অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বালীগঞ্জের বাসা ছেড়ে দিয়ে সুরেশ উঠে এল হ্যারিসন রোডে তার একদূর-সম্পর্কের ভাইয়ের বাসায়। ভাইটি সুরেশের এই দুঃসময়ে তার স্ত্রী-পুত্রকে আশ্রয় দেওয়ায় — সে খুব কৃতজ্ঞ হ'ল।

চাকরীর চেষ্টায় সুরেশ ঘুরতে লাগ্‌লো ক'লকাতার

রাস্তায় রাস্তায়। চাকরী সে পেল না কিন্তু অনেকদিনের অনেক চেষ্টার ফলে একটি সম্ভ্রান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একটি এজেন্টের কাজ পেল। বেশীভাগ সময়ই তাঁকে থাকতে হয় কলকাতার বাইরে। স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য সুরেশ কিছু টাকা পাঠায় ভাই-এর কাছে মাসে মাসে।—

ইতিহাসের পাতা দমকা বাতাসে অনিশ্চিত উল্টে যায় — পৃথিবী আধুনিকতম পর্য্যায়ে এসে পড়ে।—

* * * * * *

আগস্ট বিপ্লবের পর আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশবাসীর মনে নূতন অনুপ্রেরণা দান ক'রেছে। মনে "ভারত ছাড়" দাবী আর মুখে "দিল্লী চলো" ধ্বনি ক'রে ভারতবাসী ছুটে চলেছে জয়যাত্রার পথে। ছাই-চাপা আগুনের মত ভারতবাসীর বিপ্লবাত্মক আকাঙ্খা কোন মতে চাপা থাকলেও এখানে ওখানে প্রকাশ হ'য়ে পড়ছে। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন জয় যুক্ত হ'তে চলেছে। কলকাতা ও বম্বের রাজপথে হিন্দুমুসলমান, কৃষক মজুর, ছাত্র- শ্রমিক অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রতে গিয়ে, নিজেদের ও দেশবাসীর সম্মান ও ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠা ক'রতে বুকের রক্তে ইতিহাস রচনা ক'রে গেল। নৌবিদ্রোহ, নিখিল ভারত ডাক, তার ধর্মঘট, বম্বের ধর্মঘটের স্মারকে বিলাতের কর্তাদের সুখনিদ্রা ছুটে গেল। চোখ ডলতে ডলতে মন্ত্রীত্রয় ছুটে এলেন ভারতে। দেড়শতাব্দীকাল ধ'রে ইংরেজ ভারতকে শোষণ ক'রবার জন্য প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যে প্রশাসনযন্ত্র নির্মাণ ক'রেছিল এইবার সেই প্রশাসনযন্ত্রের শক্তি পরীক্ষার সময় এল। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কারাগার, দ্বীপান্তর, ফাঁসী, বেয়নেট-চার্জ, বন্দুকের গুলি, কঠিন শাসন দিয়েও যে ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্পৃহাকে নিস্তব্ধ ক'রতে পারে নাই

নি, ওদের পর্যুদস্ত করতে ইংরাজ ছাড়লো তার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র — আনবিক বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর — সাম্প্রদায়িকতার বিষ মাখানো বিষাক্ত তীর।

* * * * * *

১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস। আজ প্রায় ৯মাস সুরেশ কলকাতার বাইরে। কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে সে খবরের কাগজ থেকে মোটামুটি খবর জেনে নেয়। একদিন সে দেখলে,

"Bengal government declares 16th August a public holiday."

মোসলেম লীগ ঘোষিত আসন্নপ্রায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ১৬ই আগষ্টের কথা চিন্তা ক'রে অজানা আশঙ্কায় সুরেশের বুক দুরু দুরু ক'রে ওঠে। কাজের চাপে আর সে কথা তার মনে এল না। অনেক দিন পর সুরেশ ফিরে যাচ্ছে কলকাতায় তার স্ত্রী পুত্রের কাছে। কতদিন সুরেশ ওদের কাছছাড়া....।

আবার সে চলেছে তার প্রিয় আত্মীয় স্বজনের কাছে। — যেখানে একটি নীড় সর্বদাই তাকে যেন ক'রবার আশায় উন্মুখ হ'য়ে ব'সে থাকে। এতদিনের পরিশ্রমের বেদনা আর গ্লানি সমস্তই যেন সেই সুখের আশায় মন থেকে মুছে যায়.....।

গাড়ীতে সে শুনলে কলকাতায় শুরু হ'য়েছে ভীষণ দাঙ্গা। মনে মনে সে ভাবে — গাড়ী কখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রবেশ ক'রবে। শিয়ালদহ ছেড়ে একটু হেঁটে হ্যারিসন রোডের যে লাল বাড়ী, তারই দোতলার একখানি ঘরে থাকে তার স্ত্রী আর পুত্র।

গাড়ী ষ্টেশনে ঢুকল। কিন্তু বাইরে ভীষণ দাঙ্গা বেধেছে

ব'লে কাউকে স্টেশনের বাইরে যেতে দেওয়া হ'ল না। দুইদিন প্লাটফর্মের মধ্যে আটকা থেকে সে শুধু বাইরের বন্দুকের শব্দ, প্রেতের অট্টহাস্য — "আল্লা হো আকবর", আর "জয় হিন্দ" ধ্বনি শুনেছে —। কিন্তু দাঙ্গার বীভৎসতা সে কল্পনা ক'রতে পারল না। সে কল্পনা ক'রতে পারল না যে, মানুষ তা'র মনুষ্যত্ব হারিয়ে একেবারে হিংস্র পশুর কোঠায় এসে নেমেছে। সে শুধু ভাবতে লাগল কখন গেট খুলবে, — কখন সে আবার দেখতে পাবে তার স্ত্রী পুত্রকে। —

এই ত মানুষের প্রকৃতি। বিপদ আসার সম্ভাবনাতেই তারা নানারকম দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে — মনকে সান্ত্বনা দেবার কিছুই আর খুঁজে পায় না। — কিন্তু সত্যি যখন বিপদ আসে তখন আশঙ্কার চেয়ে তাদের আশাই থাকে বেশী।

তৃতীয় দিনে গেট খোলা পেয়ে সুরেশ ছুটে চলল কোনও দিকে না তাকিয়ে হ্যারিসন রোডের সেই বাড়ীটার দিকে। সেখানে গিয়ে কতটুকু দেখবার শক্তি তার ছিল — ভগবান জানেন। বোধ হয় সে দেখেছিল তারই সামনে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। ভিতরে বোধ হয় আসবাব পত্র, জনপ্রাণী কিছুই ছিল না, শুধু ছিল চাপ চাপ রক্ত — আর খণ্ড-বিখণ্ড দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ......।

মাথা ঘুরে সুরেশ সেই খানেই প'ড়ে যায়......

* * * * * *

পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের রক্তিমাভা। —
বিংশ শতাব্দীতে দশদিক মুখরিত ...।
স্বাধীন ভারতের স্বাধীন গণতন্ত্র আজ বিশ্বের দরবারে সংসারে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত ...। হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খৃষ্টান কোনও বিভেদ আজ আর নাই।

ভারতবাসীর সম্মিলিত শক্তি ভারতকে জগতের প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত ক'রেছে। স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র আজ শিষ্টকে রক্ষা করা ও দুর্জনকে দমন করার মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছে। বিশ্বের শোষিত জনগণ আজ বুক ভরা আশা নিয়ে ভারতের পানে তাকিয়ে আছে। আর স্বার্থান্ধ শোষক সম্প্রদায় দুরু দুরু শঙ্কিত বক্ষে দেখছে তাদের লীলা শেষ হ'তে চ'লেছে.....

শাঁখের ডাক সুরেশের স্বপ্নাবেশ ভেঙ্গে যায়.....

শেষ

— ০ —

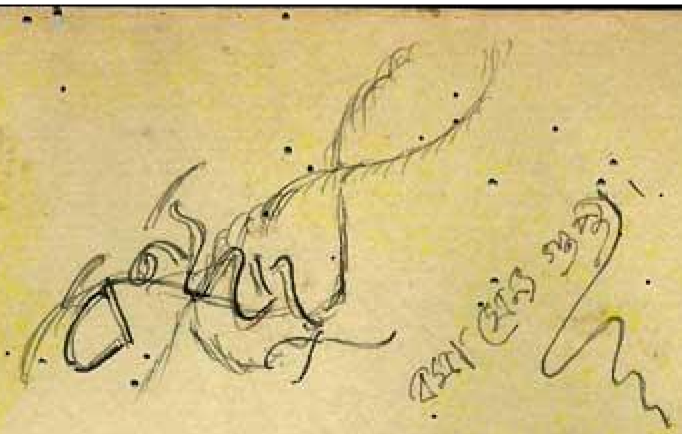

এখন কোন কাজ যখনকার এমনি মনে হয় হয়, একে ওকে দেখে দেখি;
ইচ্ছে করছে দেখে চারটি চারটে পালাল, মনে হয় এর মধ্যে অনেকে
হয়ে গেছে হয়, আবার মনে, ঘটনাক্রমে এমনি হাসি হাসি মনে হচ্ছে
অনেকের মুখে হাসি।
তখন যারা মনে কলেজে উঠেছি, সবে স্কুল থেকে কলেজেতে এসেছি। নিজের
উপরে খবরদারী করবার কেউ নেই, দিন নেই, রাত নেই মনটার মত রেখে
স্বাধীন মনে শুধু উড়ে উড়ে চলেছি, চারিদিকে বিস্ময়ের আর অন্ত
নেই। সে একটা সময় গেছিল দিন।

সুধেন্দু একটা ছেলে দেখতে সুন্দর
কথা বলে, খুব forward। আমি ওকে শুধু দেখে দেখি, ও কথা বলে
আমার সঙ্গে শুরু করে, এমনি ভাবে আমাদের দুজনের ভাব হয়ে
গেল। তারপর দুজনের [illegible] যে আর ফুরোয় না, এমনি কত দিন
চলে গেল।
কতকগুলি মাসের এমন হয়ে গেল — দুজন দুজনকে ছেড়ে —
কলেজের hostel এ দুজনে একসঙ্গে থাকতে লাগলাম, ক'বছরটা যে
কী চমৎকার লাগত! দিন নেই, রাত নেই দুজন দুজনকে দেখে কত খুশি
কত কথা দুজনের মধ্যে। কলেজের ওদের ঘুম দেখে যাবে, কেন দুঃখী
নয়, কেন উৎসাহ নয় — সুন্দর কণ্ঠস্বর। সে ডাকল — অনুভব!
আমি অবাক, বিস্মিত! তারপর কথা বলতে বলতে ভোর
হয়ে যায় দেখি আবার সেদিনই শুধু পড়লাম, ও কে দেখে
এখন বসে চলে আসি, সে যে কি কষ্ট! খুব সকলের সামনে
ধারাবাহিক ভাবে কথা বলতে শুরু করে, মনে হয় সে যেখানে
আছে সকলকে আপনার করে নিয়ে। কখনও বা শুধু চুপ করে
বসে থাকি। কত কি যে মনের মধ্যে এসে উঁকি মারে, আবার
কখনও বা হৃদয়ের অন্দরে ভেসে থেকে এসে দেখি,

মেঘের দূরের সমুদ্রসৈকতের দিকে চেয়ে, মনের সে কেমন কেমন সময়ে অনুভূতি, কেমন কাতর আর অস্থির।

বাড়ীর চিঠির জবাব লেখার চিঠি লেখার সময় হয়, তবে চিঠি যেদিন আসে সেদিন কত আনন্দ। কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণে সেদিন এখানে কাটিয়ে গেছে, আনন্দ এত ছিল, মনে হত কেমন দুঃখ আর কষ্ট নয়। সত্যিকারের এত দুঃখ কেন রয়েছে দেখবার চোখ মন খুলেছিল।

বন্ধুর সাথে আর একটি মেয়ের আলাপের পর, পরিচয় হল আমার সাথেও। দুজনের একজনকে চিনত বটে, কিন্তু আর এক জনের কোনদিন কাছের সামনে দেখা দেয়, মনে হত চেনা অচেনার আমার হাতে, কিন্তু বিকেল বেলা আমাকে বলে দিল, 'ওর অচেনা দিকে — ভালবাসার খেলা খেলে মনকে যে আনন্দ দিতে করতে হয়'; ঠিক এমনি সময়ে আমাদের কাছে ঠিক হল, আমি hostel ছেড়ে দিলাম, তবে মনে লাগত', দেখা হলেই সেই মেয়েটি জিজ্ঞেস করত 'আজ বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে?' হাসতাম কিছুর অজান্তেই 'হাঁ — না'। আমাদের আজ ৫/৭ দিন দেখা নেই', একদিন উত্তরের আগেই হেসে মেয়েটি বলত, 'তুমি — তুমি আর কি? অসুস্থ বন্ধু একদিন দেখা না হলে কি হবে।' এই বলে মেয়েটি আবার হাসত। এই হাসিতে একটা ইঙ্গিত থাকত; অর্থাৎ 'অন্যের দেখা পাবে'; আমি হেসে বলতাম — 'আমার ত' এই ছিল, এখনো আপনি যদি হন আমাদের বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটাবেন।' * * * * * *

আরও দিন গেল, বন্ধুর সাথে কখনও দেখা হয় কখনও বা হয় না, কখনও সবার ভিড়ে অনেক কথা আর কখনও মোটে কথাই হয় না। মাঝে মাঝে বন্ধুকে অন্যমনস্ক বলে মনে হয়, আবার মনে হয় এই অন্যমনস্কতাকে বন্ধু যেন কোন আড়াল করে রাখতে চায়, কেমন যেন লুকিয়ে রাখা হয়। মুখে কিছু বলি না, জানবারও ত' কিছু নেই।

নব নব ঘটনার স্রোতে অনেক দিন দেখা হয় নি। আবার সুযোগ একদিন হয়েছিল, রাত্রির শুধু শুধু সুযোগ এমনি করে কথা বলতে চাই; পারিনি। সত্যিই মন দিয়ে দেখা করি শুধু পারিনে, বড় কষ্ট হয়, যে নেই, সে আর আমাদের নয় তার দেখা হবে কারো তার মৃতদেহটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে এমনকি ইচ্ছে, কেমন একটা বিশ্রী লাগে, যখন মনে হয় নিজেকে একেবারে একা হয়, বড় ফাঁকা লাগে। * * *

আজ বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেল, খুব ভাল হল।

একলাটি বসে বসে কত কি যে ভাবি। আমাদের জীবনের সেই সব দিনগুলিতে এই লোকটিকে অবলম্বন করে কি আমি পেয়েছিলাম, কী আমি হারালাম।

জীবনের মেঘছায়া এমনি করে আমাকে কখনো আসে, যখন যখন তারই সাথে তার আনন্দ, তার বেদনা। এখন আমাকে দেখা দেয়, আমিও দেখতে পাই, হাসি লাগে। বন্ধুবান্ধবদের এই মনোবেদনাটিতে আর আমাদের এই দিনের এই স্মৃতির সুরে মিশে গেল। একলাটি বসে শুনতে লাগলাম, এ সকাল হয়েও তবু কি যেন একটা ফেলে আসা কথাই শুধু মনে রয়ে গেল। * * * *

—o—

দুর্ঘটনা।

শ্রীবীরেশ বসু।

১৩৫০ সালের বাংলা — ভয়ঙ্কর দুঃসময়! সর্বনাশক, হৃদয়-বিদারক দৃশ্য একের পর এক ঘটে যাচ্ছিল; সেই বছরই, বাংলায় এমনি একটা দুঃসময়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিল বিনতা, তার ছয়বছরের ছেলে মন্টুর হাত ধরে।

পূর্বে বিনতা ছিল সুখী পরিবারের আরও সুখী গৃহস্থ বউ। তার স্বামী ছিল কারখানার কুলি। সকালবেলায় বেরিয়ে যেত আর ফিরত সন্ধ্যাবেলায়, পরদিনের আহারের সংস্থান মজুরি নিয়ে। স্ত্রী, পুত্র এবং নিজে, এই নিয়ে ছিল নরেনের সংসার। ভদ্রলোকের ছেলে সে — কিন্তু লেখাপড়া শিখতে পারেনি — কিছুটা অমনোযোগিতায় আর কিছুটা অর্থাভাবে। তাই আজ নরেন কারখানার কুলি।

আগেই বলেছি, নরেন তার ছোট্ট সংসার নিয়ে ছিল সুখী। নরেন চাকরী করত, আহার করত এবং করাত; কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ লোকের পেটে না খেয়ে মরমর অবস্থা — তখন নরেনের মত একজন সামান্য কুলী থাকবে সুখী? এও কি কখনো সম্ভব? তাই —

হঠাৎ নরেন মারা গেল। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কালে মরার জন্য কোন কারণ খুঁজতে হয় না। এমনিতেই হঠাৎ মারা গেল সে একদিনের ওলাওঠায় — তারপর? বিনতা বেরিয়ে এল তার শিশুপুত্রকে কোলে টেনে নিয়ে পথে। হয়ত আরও কয়েকদিন বস্তিতেই থাকতে পারলেও চলত তার। কিন্তু এক-দিনের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল তার কাছে। তাই শহরগামী জনস্রোতের মধ্যে একটি কুটোর মত মিশে গেল সে। অবশেষে সে এল মহানগরী — কলকাতায় -

কলকাতা ১৩৫০ সময়টা ছিল - মুনাফার - বড় হবার সময় -- মজুতদার -
কালোবাজারি - ভিখারিদের - কাল - সে সময়টা হয়েছিল বাংলার "কাল"। মন্বন্তর
মানুষের - প্রীতি -- কলকাতার - সৌন্দর্য - আর - ঐশ্বর্য উপাদের - প্রীতি -
ফুটপাতে অন্তরের - মরা - আর ... অর্থাৎ - লোকের উপবাস সাথে -
দুর্ভিক্ষের - সাথে। এই হোল ১৩৫০ এর - কলকাতা -। এমনি সময় -
ফুটপাতের - এখানেই - আশ্রয় নিল - বিনতা - আর মনু -। ...
বিনতা — সম্বল — শুধু এখানকার ... থালা — একটি ঘটি আর -
ছিন্নবস্ত্র - মাত্র সম্বল - এখানে ... - আর - একটা - ছেলে -
অবশ্য - নূতন নয়।

বিনতা - কেবল ভিক্ষে করে - খেয়ে - বেঁচে থাকা - আর
কলকাতায় - ভিক্ষে পাওয়া যায় না -। সকলেই - ভিখারী কম আর বেশী - কে
দেবে ভিক্ষা? ধনী — ভিখারী - ও দের ... - মহাজনের - ...
ভিখারী — ... - সামনে লম্বা - লাইন করে দাঁড়িয়ে ...
ধরে - একমুঠো - চাল না - পাওয়া দিন — এখন - একবেলায় ...
আশায় - আর কবে? - ... - ভিখারী - অর্থাৎ ...।
... বিনতা - ভিক্ষার - ... - ছেড়ে দিল। চাকরি - ... - এখন
... - ... আশায় - ঘুরতে লাগল।

অবশেষে - জুটেও গেল - একটা - ... - সংসারে -
... - ... । ... - বলার - ... — গৃহস্থের - ... - ছিলেন -
... - অর্থাৎ - ... -
... - ... করে বেশ ... -
... - ... হবে - ... -
নিয়েছেন। ... - এখন - হন নি। তবে যুদ্ধ চলতে থাকলে হবেন - ... -
তাই বললাম - অর্ধ ধনী -। এইরূপ - একটি - গৃহস্থের - ... বিনতা - ...
তার - ... - ...।

দিন - একরকম - কেটেই যাচ্ছিল - বিনতার - মন্দ নয়। ...
... - ... মাঝে মাঝে - বেশ ... । আর - মাঝে মাঝে -
অন্যমনস্ক - হয়ে পড়ায় - হত - ... - ভুলচুক। তার - ...
... - ... । ... গেল তার -

কিন্তু বিনতার দুঃখের শেষ হয়নি এখনও। তাই মন্টু ও চলে গেল তাকে ছেড়ে = কাঁদিয়ে তার মনের কোণে। চির দারিদ্র্যের অসহায় বিনতা বুঝতে পারলে না কেমন দিয়ে কি হয়ে গেল — বিনা চিকিৎসায় মারা গেল সে একদিনের জ্বরে। কুঁড়ুনীর ছেলের জ্বর ভাল হয়েছে অর্থে একদিন সন্তানের বিছানার থেকে উঠতে পারে না বাবুদের তরফ হতে সে। সেও যখন উঠল তখন সব আশা শেষ হয়ে গেছে মন্টুর জীবনের। স্বামী পুত্রহারা বিনতা। সমস্ত সংসারের মাঝে একেলা বিনতা নিঃসহায় নিঃসম্বল বিনতা। পারলে না সে আর স্থির থাকতে [illegible] আবার সে বেরিয়ে পড়ল ফুটপাতে। মিশে গেল লক্ষ্যহীন জনস্রোতের মাঝে বুদবুদের মত।

শীত লাগেনা আর কলকাতার তার কাছে। শুধু দুঃখ বেদনা অনাহার চিৎকার আর মেটেনি। পারে কি মানুষ এখানে থাকতে। নিশ্চয়ই কিন্তু পাগল হয়ে যাবে। "পালাও — পালাও যে যেখানে আছ — পালাও। সব মরে যাবে। কেউ বাঁচবে না। হি-হি-হি-হা-হা-হা।"

অন্ধকার নামে শেষ হয়ে গেছে। একটি মেয়েলোক ছেঁড়া কাপড় ও ময়লা সারাদিন ঘুরছে। আর চেঁচাচ্ছে "পালাও পালাও" হাসছে পাগলের মত অদ্ভুত এর কেউ নয় — স্বামী পুত্রহারা উন্মাদিনী বিনতা।

কিন্তু বিনতার এ দুরবস্থার অবসান। সভ্যতার সেরা সমাজ সহ্য করে এই কদর্য ব্যবহার। একটি ভ্যানগাড়ী যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে হঠাৎ তার কেউ দৃষ্টি পড়ল উঠল। বিনতাকে দেখে সে তুলে নিয়ে চলল সেইদিকে থানার দিকে। কিন্তু জানালো সেই পথের বিক্রমেও পাগল — হলনা বিনতা। হঠাৎ একটুখানি অসময়ে ভুলে নিয়ে সে মারল ছেঁড়া কাপড়ের আঁচল। "শ্রীরামপুর" বলে ছুটে পড়ল সে। কেমন অনেক খানি দেখে ছুটে পড়ল সে। কেবল ধারে একটু ঝিমিয়ে পড়ল [redacted] পুলিশভ্যানে সেই সময় সেইখান দিয়ে একটি পুলিশভ্যান যাচ্ছিল। ড্রাইভার কনস্টেবল এই পাগলিনীকে দেখে আরও সিপাহীদের আর বিনতাকে নিয়ে চলল থানায়।

বিচার হ'ল বিকাশের না। রায় বেরোল। পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড নরহত্যার চেষ্টার অপরাধে। হায়রে-বিচার! এমন আদালত আর এমনি বিচার। কয়েদী সাথীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিকাশকে জেলখানার দিকে। রাজপথের উপর দিয়ে ছুটছিল পাঁচ-ভ্যান। লরীর মধ্যে ছিল সশস্ত্র সিপাহীরা পাহারার জন্য। কিন্তু অকেজো লরী বলে তারা বেশী নজর রাখবার প্রয়োজন মনে করেনি। তারা নিজেদের মধ্যে রহস্যালাপেই মগ্ন ছিল। মাঝে মাঝে বিকাশকে লক্ষ্য করে কুৎসিত ইঙ্গিত করছিল। কিন্তু হঠাৎ "কি হ'ল"? "কি হ'ল"? বলে সচকিত হয়ে উঠল সাথীরা সব। দেখা গেল রাস্তার অন্যদিক হতে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছিল একটি "বিশেষ ধরনের" লরী। বিকাশ হঠাৎ কয়েদী গাড়ীর উপর হতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে ঐ লরীর চাকার নিচে। মাংসের মধ্যে হয়ে গিয়েছে নিষ্পেষিত নিশ্চিহ্ন। পথের লোকেরা চিৎকারের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার ধারে কেউ বললে - "আহা - মরে গেল?" কেউ বলল রাস্তার ভিখারী না খেতে পেয়ে ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে। কেউ বা বললে যাক ও সবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ সময়ে সহানুভূতি দেখাবার লোকের অভাব হয় না। সিপাহীরা ছুটে নেমে লাশ নিয়ে চলে গেল। আর "বিশেষ ধরনের লরী" অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে। লরীর নম্বর ছিল বিজ্ঞপ্তির বিষয়। এ রকম দুর্ঘটনার দিকে ফিরে তাকাবার সময় - খুব কম তার।

বাকী বন্ধু
দুলাল

টুকরো সন্দেশ.

স্কুলের-কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স :— ১৩৫৩-৫৪ সালের কার্য্যনির্বাহক সমিতি।

১। শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র বসু — সভাপতি।
২। " মনোরঞ্জন দাস — সম্পাদক।
৩। " সুশীল ঘোষ-(২য় শ্রেণী) } সহঃ সম্পাদক।
৪। " চিত্তরঞ্জন দে-(৯ম) }
৫। " সত্যেন্দ্র কুমার বসু
৬। " কালিপদ ঘোষ
৭। " অশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী।
৮। " হরিশচন্দ্র ঘোষ
৯। "

স্কুলের হিতৈষী সমবায় সমিতির ১৩৫৩-৫৪ সালের কার্য্যনির্বাহক সমিতি:—

১। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন তর্কতীর্থ — সভাপতি
২। " চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী — সম্পাদক।
৩। " দুর্গাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী —
৪। " সুরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী।
৫। " দিবাকর পাল চক্রবর্ত্তী।
৬। " সতীশ চন্দ্র দে (ড্রইং মাষ্টার)।
৭। " বিনয় কৃষ্ণ দে।
৮। " অমিয় কুমার সান্যাল।
৯। " রবীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

বীণাপাণি পুস্তকাগারের ১৩৫৩-৫৪ সালের জন্য গঠিত
কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি :-

১। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ সেন — সভাপতি
২। " প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী } সহঃ সভাপতি
৩। " শ্রীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী
৪। " বীরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী — সম্পাদক।
৫। " রমেশ প্রসাদ সেন — } সহঃ সম্পাদক।
৬। " ভোলা নাথ রায় চৌধুরী —
৭। " রবীন্দ্র নাথ সেন।
৮। " চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য -
৯। " অজিত কুমার রায় চৌধুরী - (কোষাধ্যক্ষ)।
১০। " শৈলেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত
১১। " সুনীল কুমার রায় চৌধুরী — (সাময়িক)
১২। " হরশ্চন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী।

কিশোর সাহিত্য- সেবা সমিতির ১৩৫৩-৫৪ সালের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি :-

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী — সভাপতি।
২। " অমিয় কুমার রায় চৌধুরী — সম্পাদক।
৩। " শ্যামল কুমার রায় চৌধুরী — সহঃ সম্পাদক।
৪। " তনয় কুমার রায় চৌধুরী।
৫। " কমল কুমার সেন।
৬। " ভোলা নাথ রায় চৌধুরী।
৭। " অনিল কুমার সেন।
৮। " শঙ্কর কুমার সেন। সেবা সমিতির পুনর্গঠন উদ্বোধন, মুদ্রিত বিবরণ
আছে। সেবা — এই সেবা সমিতির উক্ত সমিতি ৫/মার্চ তারিখে ও এর কোষাধ্যক্ষ
দ্বারা ১৩৫২-৫৩ সালে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।
মূল্য সহ সাত টাকা প্রেরিত

(৫৫ পৃষ্ঠার পর)

ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহারা পূজার জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করিয়াছেন তাহা খুবই সুন্দর কিন্তু স্থানটি গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত। অপর প্রান্তের অধিবাসীগণের উহাতে যোগদানের সুবিধা হয় না। এইজন্য আমরা মনে করি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে এরূপ উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া সেখানে পূজার আয়োজন করিলে সকলের পক্ষেই সুবিধা হয়। ~~[illegible]~~ এই বিষয়ে দৃষ্টি দিতে আমরা তাঁহাদের অনুরোধ করিতেছি।

শারদীয় উৎসব:— গত ২৩শে আশ্বিন বীণাপাণি ক্লাব-এর সপ্তম বার্ষিক শারদীয় উৎসব হইয়া গেল। মুলাজোড়-গ্রামে শারদীয় উৎসবের প্রবর্তন করেন [illegible] ৺ [illegible] রায়। অদ্য তিনি আমাদের মধ্যে নাই। উৎসব সূত্রে তাঁহার অভাব স্বভাবতঃই বোধ হইতেছিল।

প্রাথমিক উদ্বোধনের জন্য উৎসবটি একরূপ [illegible] সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। বিশেষতঃ [illegible] স্থানে [illegible] অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। শ্রীযুত তারাপদ [illegible] তাঁহার স্বরচিত "নব মেঘদূত" পাঠ করেন, তীর্থ-মহাশয় [illegible] পাঠ করা এইরূপ সাধারণ উৎসবে এইরূপ [illegible] উচিত বলিয়া আমরা মনে করি না। উৎসবে মাস্টার শ্রীযুত উপেন্দ্র [illegible] রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চনদের তীরে" কবিতা সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের [illegible] আবৃত্তি [illegible] অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

"দুই পুরুষ" অভিনয় —

গত ২২শে আশ্বিন ৺ ডাঃ জ্যোতীশচন্দ্র রায় চৌধুরীর গৃহ প্রাঙ্গণে মুলাজোড় পূর্ব পল্লীর তরুণ দলের উদ্যোগে ও [illegible] পরিচালনায় [illegible] শ্রী ভবনাথ রায়ের "দুই-পুরুষ" নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ের মধ্যে [illegible]
[illegible]

১৯[illegible]-৪৬ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় স্কুল ঘরের স্থান।

ইন্ট. মি.

শ্রী পরিতোষ দাস।

„

„

এম. ই.

„ অনিতা বসু।

„ পদ্ম মিত্র।

„ মীরা গুহ।

প্রবেশিকা -

শ্রীশঙ্কর প্রসাদ রায় চৌধুরী।

„ কৃষ্ণকিশোর ঘোষ।

„ মনোতোষ দে।

„ বিমল নাথ রায় চৌধুরী।

„ কমল চন্দ্র রায় চৌধুরী।

„ অনিল কুমার রায় চৌধুরী।

„ অমল কুমার সেন।

„ মাধুরী বসু।

„ অশোক রায় চৌধুরী।

„ লীলা রায় চৌধুরী।

„ পূর্ণিমা রায় চৌধুরী।

„ মীরা রায় চৌধুরী।

„ নিভা রায় চৌধুরী।

„ অরুন্ধতী গাঙ্গুলী।

„ বীণা দে।

এম.-এ.

শ্রীঅসিত কুমার রায় চৌধুরী - অর্থশাস্ত্র।

„ কালীপদ দত্ত - („)

এম.-এস.সি.

„ পশুপতি সেন গুপ্ত - গণিত [illegible]

„ সুরেশ চন্দ্র বসু - [illegible] („)

আই-এস.সি.

শ্রীবিশ্বনাথ রায় চৌধুরী।

„ সুহাস রায় চৌধুরী।

„

বি-এ.

শ্রী গৌরী রায় চৌধুরী।

„ অমিত কুমার ভৌম

বি-এস.সি.

„ ভবনাথ রায় চৌধুরী।

„ (বাদ)

বি-কম.

„ শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

„ হরিহর চন্দ্র ঘোষ।

„

আমাদের কথা।

'অগ্রদূতের' উভয় ঈদ - শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হইল। সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত থাকায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও পত্রিকাখানিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করা সম্ভব হয় নাই। প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ একখানি পত্রিকা থাকার দরকার যাহার মধ্যদিয়া গ্রামের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের গুণাগুণ দিক লেখা চিত্রিত সমালোচনা ছাপা যায়। এইরূপ একখানি পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করিয়া পাঁচ বছর আগে ১৩৪৮ সালে এই গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী তরুণের প্রচেষ্টায় এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা হয় - তখন এর নাম ছিল "অগ্রপথ"। পত্রিকার "আমাদের কথা" শীর্ষক- নিবন্ধে এই গ্রামের সমস্ত অভাব অভিযোগ, প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের গুণাগুণের আলোচনা করা হয়।

মূলঘর ইউনিয়ন শান্তি কমিটি :—

গত ৮ই সেপ্টেম্বর '৪৬ (বাংলা ২২শে ভাদ্র, '৫৩) রবিবার মূলঘর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি অধিবেশন হয়। সভায় মৌলবী নাসিরুদ্দিন আহমদ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে মূলঘর ইউনিয়নকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইতে মুক্ত রাখিবার উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষে এই ইউনিয়নের অন্তর্গত সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধি লইয়া একটি ইউনিয়ন শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।

এই শান্তি কমিটি গঠনের জন্য আমরা উক্ত কমিটির সভাপতি, মূলঘর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দ আবদুল হামিদ আলম সাহেব ও কমিটির সম্পাদক, মূলঘর ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুত কেদারনাথ মিত্রকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আমরা আশা করি এই শান্তি কমিটির সদস্যগণ এই-

সম্পাদকীয়

শান্তি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য [illegible] সফল করিবার জন্য যথাসাধ্য
চেষ্টা করিবেন এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন গুলিতে যাহাতে অচি-
রকাল মধ্যে শান্তি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার দিকে
দৃষ্টি রাখিবেন।

এই শান্তি কমিটি যাহাতে শুধু মাত্র অন্তর্গত ভিলেজ
ইউনিয়ন লইয়া একটি সাধারণ শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাব
লইয়াছেন — তাহা যত শীঘ্র কার্য্যকরী হয় ততই মঙ্গল।
আমাদের মনে হয় উৎসাহী তরুণ সমাজকে লইয়া এমন একটি স্বেচ্ছা-
সেবক বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন যাহারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য-
রক্ষা করিবে। শান্তি কমিটিও ইহাদের সর্বদা সাহা-
য্য করিবার জন্য এই শান্তি কমিটি সর্বদা সাহায্য
করিতে প্রস্তুত।

সার্বজনীন দুর্গোৎসব :—

একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে একটি সার্বজনীন
মুলঘাটের মত একটি গ্রামে যে কতখানি তাহা মুলঘাট-
দুর্গাপূজা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন। গত ১৩৫২ সালে
গ্রামবাসী প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিয়া সার্বজনীন দুর্গা পূজা করা
হইতে মুলঘাটে একটি সার্বজনীন বর্ণবৈষম্যের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে বর্ণবৈষম্য দূর হইয়াছে। কাজেই এই সার্বজনীন
পূজাটির সাফল্য উপলব্ধি হইয়াছে। এই সার্বজনীন হয়, এই দুর্গো-
ৎসবটি যাহাতে প্রকৃত পক্ষে সার্বজনীন হয় এই পূজার আন্তরিক সহযোগের
সম্মুখে যাহাতে বর্ণহিন্দু ও হরিজন সকলের সমান দৃষ্টি রাখিতে
সমান অধিকার থাকে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে
হইবে। গ্রামবাসী সকলের নিকট আমাদের অনুরোধ তাঁহারা
যেন এই সার্বজনীন পূজাটিকে নিজের বাড়ীর পূজার মতই
মনে করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া ইহাকে
আদর্শ সার্বজনীন পূজায় পরিণত করিতে পারেন।
এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য আমরা দুর্গাপূজা কমিটিকে
(৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়।

"আগে চল"-র চলার পথে বহু গুলি বাধা আসিয়া পড়ায় তাহার অগ্রগতি সাময়িক ভাবে রুদ্ধ হইয়াছিল। পাঠক পাঠিকা ও শুভাকাঙ্খীদের শুভেচ্ছা ও সহযোগীতা তাহার পথের বাধা অপসারিত করিয়া দিয়াছে। "আগে চল" আবার আত্মপ্রকাশ করিল "শারদীয়া সংখ্যা" রূপে।

শরতের দিন গুলিকে বাঙালী বহুপূর্ব হইতেই বড় ভালবাসিতে শিখিয়াছিল। শিশিরসিক্ত দূর্বাদলের উপর শরতের সোনালী রোদ ঝিকমিক করিত, দুরিত শস্য ক্ষেত্রে ও শ্বেত কাশ বনে ঢেউ খেলাইয়া বাতাস বহিয়া যাইত। শেফালি ঝরা শরৎ প্রভাত, দ্বিপ্রহরের নির্মল আকাশে তুলার মত শুভ্র মেঘের মেলা, শুক্ল রজনীর চাঁদের হাসি, অমাবস্যার সূচী তিমির — প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই অপূর্ব সমারোহে বিমুগ্ধ বাঙালী শরৎ কালকেই ঋতু গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিল। এমন দিনে অকালে মাকে জাগাইয়া আনিয়াছিলেন [illegible] অযোধ্যার রামচন্দ্র, কিন্তু শারদীয় দুর্গোৎসবকে বাঙালীর মত মন প্রাণ দিয়া কেহই আপন করিয়া লইতে পারে নাই।

বাঙলার বুকের উপর প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। তাহারই মধ্যে আসিতেছেন বাঙালীর মা। কিন্তু শারদ প্রকৃতিকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করিবার মত অনুভূতি বাঙালীর আজ আর নাই। মায়ের বোধন করিতে, মায়ের বন্দনা করিতে বাঙালীর মনে আজ ও আর শিহরণ জাগে না। যুদ্ধ, মহামারী, অন্নসংকট ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বাঙালী সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বহু মা হারা সন্তান ও সন্তান হারা মায়ের দল শুধু মায়ের আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য। তাহারা জগজ্জননীর কাছে জানিতে চায় কি তাহাদের অপরাধ, যাহার জন্য জাতির ললাটে এত বড় অভিশাপ তিনি আঁকিয়া দিলেন। কি তাহাদের অপরাধ যাহার জন্য গৃহহারা, অন্নহারা ও আত্মীয় স্বজনহারা হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে হইতেছে। কোন অপরাধে নিষ্ঠুর বাঙালী ভাইদের মনে অবিশ্বাস ও হিংসার ভাব জাগাইয়া তুলিলেন? মায়ের কাছে সন্তানের দল যদি এই প্রশ্নের উত্তর-

না পাইলে তবে বাঙালী সন্তানের মাতৃ আসন শক্তিরূপে তিনি পাইবেন, "জাগো মা! জাগো তুমি আবার মহিষমর্দিনী রূপে, দশভুজা ধারিণী মূর্তিতে। আবার জাগো জগদ্ধাত্রী পাপ ও অনাচার ধ্বংসের জন্য, অসুর দমনের জন্য, বাংলায় শান্তি স্থাপনের জন্য তুমি আবার জাগো।

মন্ত্রীমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকার।—

আজাদ আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযানের কাহিনী ভারতবাসীর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ভবিষ্যৎ রূপ কল্পনা করিয়া বিলাতের শ্রমিক সরকার ভারতবাসীর সহিত আপোষ মীমাংসার জন্য ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতে যে মন্ত্রীমিশন প্রেরণ করেন সিমলা পাহাড়ে ও দিল্লীর প্রাসাদে জাতীয় নেতৃবর্গের সহিত প্রায় পাঁচ মাস ধরিয়া অনেক তর্ক বিতর্ক, অনেক জল্পনা কল্পনার পর, সরকারের নিকট দাবীর পর স্থির হইল যে প্রতি দলসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া একটি গণ পরিষদ গঠিত হইবে এবং তাহারাই স্বাধীন ভারতের আইন কানুন প্রণয়ন করিবেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের স্নেহে পুষ্ট মিঃ জিন্না দাবী করিলেন যে মুসলিমলীগ বহির্ভূত কোনও মুসলমানকেই গণ পরিষদ বা অন্তর্বর্তী সরকারে নেওয়া যাইবেনা। মিঃ জিন্নার এই আব্দার টিকিল না বলিয়া তিনি অন্তর্বর্তী সরকারে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলেন। বড়লাটের ~~[illegible]~~ আমন্ত্রণে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু চতুর্দশ জন সদস্য লইয়া অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিলেন।

বহু বিভিন্ন মতামত ও সমালোচনার মধ্যে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী কালীন সরকার ও গণ পরিষদে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে অহিংস বহুদিনের সংগ্রামরত কংগ্রেস যে বিপ্লবমূলক কর্মপন্থা হইতে চ্যুত করিবার জন্যই ব্রিটিশ সরকার তাহাদের মন্ত্রিত্ব এবং ক্ষমতা দিয়াছে— তাহার দ্বারা [illegible]

বৃটিশের আন্তরিকতার চিহ্ন মাত্র নাই। অন্তর্বর্তী কালীন সরকার ও
গণ পরিষদ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের কার্য সম্বন্ধে
সমালোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। সমালোচনার
উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যাইবে গণ পরিষদ গঠন সম্পূর্ণ হইবার পর।
কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের কার্যের সমালোচনা করিতে হইলে পৃথিবীর
ইতিহাসের ছিন্ন পত্র গুলি একবার উল্টাইয়া দেখিতে হইবে।
তাহাতে আমরা দেখিতে পাইব স্বাধীনতা কামী জাতির স্বাধীনতার
সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নেতৃস্থানীয়
ব্যক্তিগণ যে সাময়িক ক্ষমতা লইয়া ভারতবর্ষের মত অন্তর্বর্তী সরকার
গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাইয়া এই অন্তর্বর্তী সরকার
গুলি দেশবাসীকে প্রকৃত স্বাধীনতার আন্দোলনের উপযুক্ত সৈনিক
রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই বিদেশী শাসকদের
হাত হইতে পূর্ণ ক্ষমতা আদায় করিয়া লইতে পারিয়াছে।

কিন্তু আজ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও মনে করেন এবং প্রচার-
করেন "কংগ্রেস ষাট বছর ধরে সংগ্রাম করার পর আজ গণ-পরি-
ষদের মধ্যে ক্ষমতা পেয়েছে" বলছে— আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।"
কিন্তু তাঁহাদের এই রকম ভুল ধারণা পোষণ করা কখনও উচিত নয়।
গণ পরিষদ যে কংগ্রেস পূর্ণ-স্বরাজ প্রাপ্তি বলিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই স্বীকার করিয়া
নিয়াছে। যে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের জন্য বৎসরের পর বৎসর যুদ্ধ করিয়া
আসিয়াছে, যে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের জন্য সহ্য করিয়াছে সাম্রাজ্য-
বাদের অকথ্য উৎপীড়ন, স্বরাজের বেদীমূলে বলি দিয়াছে সহস্র-
দেশপ্রেমিকের বীর হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতধারা, যে কংগ্রেস 'অসহ-
যোগ আন্দোলন' করিয়াছে, 'আইন অমান্য আন্দোলন' করিয়াছে,
বৃটিশের রক্তচক্ষুকে উপহাস করিয়া ১৯৪২ এর 'ভারত-ছাড়'

প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আন্দোলন করিয়াছে। যে কংগ্রেসের পথ ছিল 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যে কংগ্রেস বৃটিশের - ভারতের - স্বার্থে [illegible] ঘোষণা করিয়াছে 'লড়াইয়ে জিতিলে কেবল স্বরাজ হবে', বলিয়াছে 'লড়াইয়ে নয় এখ কাছে, না এখ ভাই', ১৯৩০ সালে [illegible] স্বাধীনতা ও পূর্ণ স্বরাজের এত প্রচারে [illegible] দাবী জানিয়েছে যে কংগ্রেস, সেই কংগ্রেসের পক্ষে গণপরিষদের প্রস্তাব যে পূর্ণ স্বাধীনতা [illegible] দাবীর নেতাদের মত সুভাষ [illegible] কেমনে কি সম্ভব?

[illegible] অন্তর্বর্তী কালীন সরকারের ১৯৪৬ প্রেসিডেন্ট - রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, 'I must make it clear to the denizens of India that this Constituent Assembly does not satisfy our demand of 'Purna Swaraj: I doubt whether this can lead to a fraction of our much-waited goal." ("ভারতের জনসাধারণকে আমি এখন স্পষ্ট করে বলিতে চাই যে এই গণ-পরিষদ আমাদের 'পূর্ণ-স্বরাজের' দাবী [illegible] পূরণ করিবে না। আমার সন্দেহ হয় আমাদের বহুপ্রতীক্ষিত লক্ষ্যের - এক অংশেরও সন্ধান যে দেবে কিনা।")

আমাদেরও দাবী ছিল যে ভারতীয় [illegible] পূর্ণ-স্বরাজ। এবং এই স্বরাজের মধ্যে স্বাধীনতা - ও সাম্য ঐক্য - ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান ভারতবর্ষের - উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-মূর্খ, [illegible] সমান অধিকারের - অধিকারেই - 'স্বরাজ'। এই 'স্বরাজ' লক্ষ্যের দিকে [illegible] পাওয়া যায় - মানুষ মানুষ মনে [illegible] প্রস্তাব আমাদের [illegible] পারে - [illegible] পাওয়া যায় [illegible] আমাদের - [illegible] এগাইয়া নাই যাইয়া [illegible]

পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে,
এই 'গণ-পরিষদ' যে দেশে হবে। এখন পরীক্ষা মাত্র বলিয়া ধরিয়া
লইয়া যাইতে পারে। এই পরীক্ষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর কংগ্রেসের
সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু কিছুদিন পরীক্ষার পর যদি এই সারবস্তু-
খুঁজিয়া না পাওয়া যায় তবে তখন ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই
চলিবে। কংগ্রেসের এই কার্য্যে - প্রত্যেক ভারত-বাসীর-সহযোগিতা
করিতে বলার অর্থ এই যে 'কংগ্রেস' বলিতে যাহা, সত্য-মুক্তিকামী
জনসাধারণ নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকে যে ~~বুঝায়~~ বুঝায় না। ~~আজ~~ আজ-
জনসাধারণ নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকে মুক্তিকামী লোকের মুক্তি তত সম্ভাবিত নয়,
~~কারণ~~ কংগ্রেস জনসাধারণ মুক্তিকামী লোকের প্রকৃত মুক্তিকামী
কংগ্রেস সকলেরই। ভারতের ৪০ কোটি জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তিকামী
জনসাধারণ-জনসাধারণ লোকে আশীর্বাদ দিতে পারেনা। রাষ্ট্রপতি-
মহাত্মা-জনসাধারণ লোকের সমর্থন করিতে পারেনা, রাষ্ট্রপতি-
গুরুর কথায় বলিয়াছেন, "Swaraj must be won by the
minimum sacrifice of the maximum number, and
not by the maximum sacrifice of the minimum,
('অল্প লোকের প্রচুর আত্মত্যাগে নয়, প্রচুর লোকের-অল্প আত্ম-
ত্যাগের দ্বারাই আমাদের স্বরাজ-অর্জন করিতে হইবে।')
ভারতবর্ষের-মুক্তিকামী প্রত্যেক নরনারী লইয়াই আজকের-
কংগ্রেস, "The Congress is not only for the masses,
as it claims to be but of the masses, and then will
it ~~be~~ really be for the masses." ("কংগ্রেস শুধু জনগণের-
জন্য-নয়-, যখন সে "জনগণের"-হতে পারবে, তখনই-প্রকৃতপক্ষে
জনগণের জন্য- হইতে পারবে" - রাষ্ট্রপতি মহাত্মা-গান্ধী),
সে জনগণের জন্য- হইতে পারবে
সুতরাং কংগ্রেসের কাজ সত্য- আমাদের- সকলেরই কাজ-
কংগ্রেসের নির্দিষ্ট- কর্ম পদ্ধতি আমাদের সকলের গ্রহণ করিয়া

তাহলেই বলিতে পারিব - 'কংগ্রেস কাজ করিতেছে'; যখনই দেখিবে তখন বলিব, "কংগ্রেস কোনও কাজ করিতেছে না," কেবলই "কংগ্রেস কাজ করিতেছে" এই কথার প্রমাণ ও প্রচার করিতে হইবে; প্রত্যেক ভারতবাসীকে কংগ্রেসকে চিনিতে হইবে, কংগ্রেসকে জানিতে হইবে, তাহার বিস্তৃত আদর্শের সমগ্র কর্ম-পন্থা অনুসারে কাজ করিতে হইবে - এবং তাহার অন্ততঃ যে কোনও একটি সফল কাজ করিতে হইবে - জন্য আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে, স্বদেশপ্রাণ শত-সহস্র নরনারীর পরিশ্রমে, আত্মত্যাগে ও রক্তাঞ্জলিতে গড়া বিশ্ব-বিখ্যাত কংগ্রেসকে স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ-উন্নতিতে সর্বোচ্চে-উন্নীত করাইবার জন্যে - অবশ্যকরণীয় সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ভারত-বাসীকে সব সময় স্মরণ রাখিতে হইবে স্বাধীনতার সংগ্রামের - সৈনিক-দলে তাঁহার সংখ্যা হয়ত গণনা আছে, সব সময় স্মরণ রাখিতে হইবে আমাদের চরম লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে।

"এখনো সমুখে রয়েছে সুচির-শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে;
বিশ্ব-জগৎ নিশ্বাস বায়ু সম্বরি'
স্তব্ধ আসনে প্রহর-গনিছে বিরলে;
সবে দেখা দিল অকূল তিমির-সন্তরি'
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক-বাঁকা;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর;
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম —

মুক্তির পথে ভারত কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছে। আর-
খানিকটা অগ্রসর হইলেই সে তাহার আকাঙ্ক্ষিত "স্বরাজ" এ উপস্থিত
হইতে পারে। এমন সময়ে পথে একটি বড় অভাবিত পর্যায় [illegible]
দিকে প্রত্যক্ষ অবলম্বন ভারতকে বিভ্রান্ত অপেক্ষা করিতে হইল। [illegible]
দিকেও উঠে যে পথের সেই বাধা হইতেছে – মুসলিম লীগ ঘোষিত "প্রত্যক্ষ
সংগ্রাম"। উগ্রতাপ্রিয়, স্বার্থান্ধ নেতা মিঃ জিন্না প্রতিদিন মিঃ চার্চিলের-
অনুগ্রহ লাভের আশায় – ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূলে যে কুঠারাঘাত করিবার-
চেষ্টা করিয়াছেন। ইসলাম সম্বন্ধে দুইটি নীতি সাজাইয়া তিনি প্রকাশ্য ঘোষণা
করিয়া দিলেন যে মুসলিম লীগই ভারতবর্ষের একমাত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান।
ব্রিটিশ সরকার যখন ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবার কথা
চিন্তা করিতেছিলেন তখন ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া মিঃ চার্চিল মিঃ জিন্নার-
সহিত গোপনে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। মিঃ জিন্না তাহার পাকিস্থানী
দাবী স্বীকার করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই ইসলামের উপর অবিচার-
সম্বন্ধে উত্তেজনাপূর্ণ মনগড়া কথা প্রচার করিয়া দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক
বিদ্বেষ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব-
মুহূর্তে বাংলার বুকে শুরু হইয়া গেল পাকিস্থানী তাণ্ডবনৃত্য। এই আকস্মিক
হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কলঙ্কময় এক অধ্যায় শুরু হইয়াছে।
তাহার বর্ণনা দিতে গেলে কোলকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরায় লেখনীর গতি রুদ্ধ
হইয়া যায়। স্বার্থপর নেতৃবর্গের হীন প্রচার-কার্য্যের ফলে ভাই
ভাইএর হস্তে নিগৃহীত হইল। আজ নয় ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের কথা মনে
আসে বাইবেলের ও একটি ঘটনার কথা। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য-
প্রাণ দিয়াছিলেন আবেল তাহার ভ্রাতা কেইনের হস্তে। ঈশ্বরের বিধানে ভ্রাতৃ-
হত্যার শাস্তিও কঠোর। আবেলের সেই অপরাধের জন্য শাস্তি
পাইতে হইল সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে। ঈশ্বরের অভিশাপে সমগ্র মনুষ্য-
জাতি হইল মরণশীল। ভাবিতে ভয় হয় – ভ্রাতৃহত্যার জন্য আবার
অভিশাপ কি আবার বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের উপর নামিয়া আসিতেছে।

বাংলার হিন্দু-মুসলমানেরা এখনও যদি তাহাদের ভুল বুঝিতে না পারেন তবে বাংলার-গৌরব, বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালীর-সংস্কৃতি-সমস্তই-লুপ্ত-হইয়া যাইবে।

এইভাবে ভবিষ্যৎ মঙ্গলেরই সূচনা করে। অনেকের মত আমরাও বিশ্বাস করি যে শাসনতন্ত্রের নিষ্পেষণে বাঙালী সর্ব্ব-মর্য্যাদা-ভ্রষ্ট হইয়াছে, শাসকদের ষড়যন্ত্রে পায়ে পায়ে লাঞ্ছনা সহিয়াছে, স্বাধীনতার সংগ্রাম-নেতৃত্বে অগ্রসর হইয়া আত্মাহুতি দিয়াছে, পরিশেষে উপর বিভক্ত হইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করিয়াছে অন্যায়ভাবে; দেশবাসীর আত্মত্যাগে সেই শাসনতন্ত্রের [illegible] অবসানের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবাসী আজ ভারতের [illegible] তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছে। আমরা আশা করি এই মহাপ্রলয়ের-পর এক নূতন সুন্দরতর পরিস্থিতি-সৃষ্টি হইবে- তখন মানুষ সকল প্রকার-বিদ্বেষ ও হানাহানি ভুলিয়া পরস্পরকে প্রেম ও প্রীতির চক্ষে-দেখিবে। আমাদের-মাতৃভূমি-আবার-ধন ধান্যে-বিভূষিত হইয়া; সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান সন্তান সন্ততি-ক্রোড়ে লইয়া- গৌরবের মুকুট-মাথায় দিয়া- বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন।

পরলোকে প্রমথ চৌধুরী —

বাংলার-সাহিত্য ক্ষেত্রে-"বীরবল" নামে পরিচিত-বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক-প্রমথ চৌধুরী-গত ২রা সেপ্টেম্বর-রাত্রি-নটায় কলিকাতায় ৭৮ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। বাংলার-সাহিত্যের ভাষায় আধুনিক চলিত-রূপের-প্রবর্তক হিসাবে তাঁহাকে [illegible]। ১৮৬৮ খৃঃ তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। 'সবুজপত্র' নামক একটি নূতন পত্রিকার সম্পাদক রূপে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁহার "সবুজপত্রে"

তিনি উচ্চাঙ্গ গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্যে সমালোচনায় wit & humour এর প্রবর্তন তিনিই করেন। "চর-ইস্তাহার", "শীতবলের মাত্রা" প্রভৃতি পুস্তক রচনায় তিনি যশস্বী হইয়া রহিয়াছেন। ১৩২৬ সালে তিনি বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য ১৩৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "জগত্তারিণী পদক" প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল।

২রা অক্টোবর —

ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রের হোতা, অহিংস আন্দোলনের প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব দিবস এই ২রা অক্টোবর। ভারতের বর্তমান সঙ্কট কালে তাঁহার প্রয়োজন যে কতখানি তাহা ভারতের জনগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে। আমরা ভারতবর্ষের "জনগণ মন অধিনায়ক" মহাত্মার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

হে তাপস! সহস্র বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথে তুমি সত্যের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছ। ভারতবর্ষের উপেক্ষিত জনগণকে এতদিন তুমি যে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলে ভারতবাসী আজ তাহার সারতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাই আজ ভারতের অরণ্য, ভারতের প্রান্তর, ভারতের গিরিশিখর হইতে তোমার উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বানের প্রত্যুত্তর পাওয়া যাইতেছে। শুধু ভারত নয়, জগতের প্রত্যেক উপেক্ষিত জাতি আজ তোমাকে অভিনন্দিত আপনার জন বলিয়া বরণ করিয়াছে। হে মৃত্যুঞ্জয়ী ব্রহ্মচারী, তাই আজ বিশ্বের জনগণ তোমার কণ্ঠনিঃসৃত বাণী শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে ভারতের নবোদিত স্বাধীনতা সূর্যের ভাস্বর জ্যোতি-উদ্ভাসিত তোমার মুখপানে!

দেশের বর্তমান সংকট-জনক পরিস্থিতির জন্য অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে "আবেদনের" শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করা হইল। এত অল্প সময়ের মধ্যেও পত্রিকা যাহাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। "আবেদন" পত্রিকার জন্য লিখিত ৺নেপাল চন্দ্র রায়ের "মানবের-দেশ" প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হইল। চিত্র শিল্পী ৺সেতুসেন রায়ের অঙ্কিত প্রচ্ছদের চিত্র এই সংখ্যায় দেওয়া হইল। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সময়ের সংকীর্ণতার জন্য এই সংখ্যায় যে সকল ত্রুটি রহিয়া গেল পাঠক-পাঠিকা গণের নিকট তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।

আমাদের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ী গণকে শুভ বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইয়া পত্রিকা শেষ করিতেছি।

সমাপ্ত